GANGCHIL

Gargi Bhattacharya

*****

COPYRIGHTED MATERIAL

গাংচিল

গার্গী ভট্টাচার্য

My website :

www.gargiz.com

দাদাকে

Do you know the difference between education and experience ?

Education is when you read the fine print, experience is what you get when you don't .

– Pete Seeger

এই বইটি আমার নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা । অনেক মানুষ দেখেছি এখানে । তাদের কথা লিখেছি । কিছু বিহরণের সময় দেখা আবার কিছু আমার চারপাশে দেখা মানুষজন । তাদের জীবন লিপিবদ্ধ করেছি । কেউ কেউ পড়ে উৎসাহিত হবেন , কেউবা আনন্দ পাবেন আর কেউ কেউ নিজেকে শিক্ষার আলোয় উজ্জ্বল করবেন । দেখবেন মানুষ কত কষ্ট ও বেদনা বুকে নিয়েও বেঁচে থাকেন , পথ চলতে চলতেই আবার আসে শিখরে ওঠার সুযোগ ও আনন্দ লহরীর পরশ । সব যখন শেষ হয়ে যায় তখনও যেন একটুকু কমলা রোদের স্পর্শ আর এক কাপ গরম কফির দৌলতে মনের জমানো বরফ মূহুর্তে গলে যায় আসে সোনালী দিনের স্বপ্নমাখা চিত্র।

কান্না হাসির দোলায় দুলছে জীবন । জীবনের সংজ্ঞা কি কেউ জানেনা । জানেনা এর থেকে মুক্তির উপায় । কিন্তু একে কী করে সুন্দর করা যায় অথবা কষ্টকে জয়

করে আবার এক মুখ হাসি নিয়ে শীতঘুম থেকে ওঠা যায় সেই সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই শুনেছি । এই বই লেখা সেইরকমই এক প্রচেষ্টা মাত্র । হয়ত পাঠক এর থেকে ঐ ধরনের কোনো কিছুর হদিশ পেয়ে উপকৃত হতে পারেন ।

গার্গী ভট্টাচার্য

গাংচিল

এই বছর মানে ২০২২ এর ইস্টারে বেড়াতে গিয়েছিলাম মাউন্ট গ্যাম্বিয়ারে । অস্ট্রেলিয়ার একটি রাজ্য সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে এই স্থান । মূলত মৃত আগ্নেয়গিরি থেকে আজ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে । আমরা ক্যানবেরা থেকে রওনা হয়ে মাঝখানে একটি জায়গাতে ছিলাম । ব্যালারাট নাম জায়গাটির । খনি শহর ছিলো অনেক আগে । এখন খনন কার্য হয়না ।

ইস্টার বলে অনেক রেস্তোরাঁ বন্ধ ছিলো । পথপাশে কিছু বিচ্ছিন্ন দোকান দেখলাম । সসেজ ভেজে দিচ্ছে । সাথে গরমাগরম কফি বা চা । স্থানীয় মেয়েরা এইসময় কিছু পকেট মানি কামিয়ে নেয় এইভাবে । আলাপ হল দোকানে মালকিন মেরির সাথে ।

চলমান গাড়িতে দোকান সাজিয়ে বসেছে । আমরা যেই রাস্তা দিয়ে চলেছি সেটা মূল সড়ক হলেও হাইওয়ের মতন ততটা চওড়া নয় । দুপাশে অজস্র বাসা ও বড় বড় মহীরুহ আছে বটে । সেখানেই পসরা সাজিয়ে বসেছে মেরি ও তার বোন চেরি ।

হ্যাঁ , চেরি ফুলের মতন সুন্দর মেয়েটি । মনোলোভা । মাথার চুলের রং লাল । টকটকে লাল । তাতে নীল জরির ফিতে বাঁধা । যেন আকাশে পলাশের আগুন লেগেছে আর তাতে সলমা জরি !

গরম খাবার দিতে দিতে বললো - আমি ব্রুনেই থেকে এসেছি । তুমি ব্রুনেই এর নাম শুনেছো ?

আমি হেসে বলি যে- হ্যাঁ । ব্রুনেই এর প্রিন্স জেফ্রির কথা কে না জানে ? আধুনিক যুগেও ভদ্রলোক হারেম রেখেছিলো । সেখানে একজন লেখিকাও ছিলেন বন্দিনী হয়ে । সেই নিয়ে লেখা বইও আছে । লাম্পট্যের জন্য কুখ্যাত এই প্রিন্স । রাজপুরুষের সমস্ত কদর্য স্বভাবই মানুষটির আছে ।

শুনে মেয়েটি খুব হাসে । তারপরে বলে ওঠে , আমি ওখান থেকেই এসেছি । আমার তিন মেয়ে ওখানে আছে আমার প্রথম স্বামীর সাথে । আমি এখানে চলে এসেছি । এসে হাতের কাজের ট্রেনিং নিয়ে কাজ করি ।

আর ছুটির সময় এইসব খাবারের দোকান চালাই । আমি আদতে মালেশিয়ার মানুষ । বলতে বলতে , বাঁশ , মুর্গি আর নারকেলের এক সবজি দিয়ে আমাকে খেতে দিলো সাথে গরম পাউরুটি । আমি আবার কফি নিলাম । বললো , পরের কাপটা ফ্রি দেবো । তোমার সাথে কথা বলতে ভালো লাগছে । সবাইকে মনের কথা খুলে বলা যায়না । তোমাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় । অথচ তোমাকে চিনিই না ! আসলে দেখলাম তুমি তোমার শ্যাডো সেল্ফকে নিয়ে যথেষ্ট পিসে আছো । তাই মনে হয় তুমি অন্যরকম ।

আসলে মানুষের জীবনে প্রেজেন্সটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ । চেনা অচেনার থেকেও । ঐ স্পর্শটুকু যে দিতে সক্ষম তাকে বিশ্বাস করতে প্রাণ চায় । একেই বোধহয় বলে আত্মার আত্মীয় ! নাহলে দেখো না ত্রিশ বছরের বিয়ে করা বৌ পালিয়ে যায় , হয় ঠগিনী-- আবার পরম বিশ্বাস ভাজন কোনো বন্ধু হয়ে ওঠে শত্রু ! আবার সম্পূর্ণ অচেনা কেউ কখনো কখনো সাহায্য করে ফেলে । এতেই বোঝা যায় মনুষ্যত্ব মরে যায়নি ।

শুধু জীবনটাকে একটু ঝাঁকিয়ে নিতে হয় । যারা ডেভেলপিং দেশে আছেন তাদের কাছে আজব মনে হলেও প্রথমসারির দেশগুলো ট্রাস্ট বেসড্ সোসাইটি হয়, তাই এখানে মানুষের আস্থা খুবই বেশি তবে

এতটা বেশি কিনা যে সম্পূর্ণ অজানা লোককে হৃদয় খুলে দেখানো যায় তা আমি জানিনা ।

মেয়েটি অনেক গল্প করলো তার মধ্যে আরেকটি মজার জিনিস হল যে ও এখানে এসে প্রথম প্রথম নাকি গার্বেজ থেকে খাবার কুঁড়িয়ে খেতো । পরে আস্তে আস্তে স্বচ্ছল হয় । কিন্তু হিম্মাৎ হারেনি । দেশে ফেরৎ চলে যায়নি । মাটি কামড়ে পড়ে ছিলো । তাই আজ সুখের মুখ দেখেছে । ওর মেয়েদের সাথে কথা হয় । পরে ওর বোন চেরি এসেছে । সে এখানকার এক যুবককে বিয়ে করেছে যে পেশায় মিস্ত্রি । ওদের ভরা সংসার । ছুটির সময় দিদিকে হেল্প করে । লাভের অংশ দুজনে ভাগ করে নেয় ।

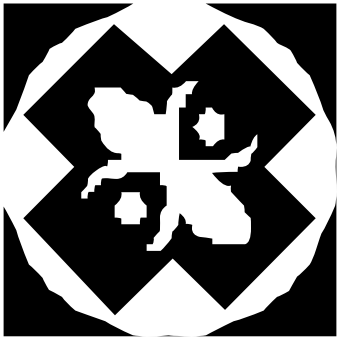

খাওয়া সেরে এগিয়ে চলি নিজেদের পথে । সুন্দর পথ । চারপাশে সবুজ ছোঁয়া । অস্ট্রেলিয়ায় সবুজ কম । ন্যাড়া ভাবটা বেশি । তবে কুইন্সল্যান্ডের দিকে খুবই সুন্দর । সবুজাভা ও তরতাজা ভাব দেখার মতন ।

আমি আর আমার স্বামী চলেছি । মাঝে একটা জায়গাতে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের জন্য দাঁড়ালাম ।

খুবই সুন্দর একটি কাফে । পেছনে বাদামী পাথুরে পাহাড় । মনে হয় গায়ে বাতাসের আঘাতে অপরূপ কারুকার্য হয়ে আছে যা কোনো ভাস্করের সৃষ্ট বলে মনে হচ্ছে । অনেকে ক্যামেরা বন্দী করছে সেই শোভা । পাহাড়ের পাদদেশে রং মিলিয়ে মানুষের তৈরি কৃত্রিম বাগান । ফুলের সমারোহ থাকলেও একটু খাপছাড়া মনে হয় ।

হাল্কা মেঘের ছোঁয়া পাহাড়ের মাথায় । আমি কিছু ছবি তুললাম । বন্ধুদের হোয়াটস্ অ্যাপ্ করবো । আমি নতুন মুঠোফোন কিনেছি । এতদিন ফোন ছিলো না ।

তারপর লাঞ্চ খেলাম ।আমার পরম প্রিয় স্যালাড ।একজন মজা করে বললো , লোকে রেস্তোরাঁতে ভালোমন্দ খেতে আসে আর তুমি কিনা ঘাসপাতা গিলছো !

কুমড়ো, পালং শাক, আলু, ডিম সেদ্ধ , টমেটো ও বাদাম দিয়ে তৈরি, মিল্ক শেক্ আর ডেসার্ট । আমি বেশি খাইনা । অল্প খেলেই আমার পেট ভরে যায় । আর আমি দিনে দুবার খাই । যোগিনী বলে কিছুটা আর কিছুটা ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং করি মধুমেহ রোগের জন্য । কারণ আমি ইন্সুলিন নিই । কিন্তু সেটা কোনো ওষুধ নয় । ওতে অসুখ বেড়ে যায় । ডাক্তার জেসন ফাং একজন নামী নেফ্রোলজিস্ট । উনি ক্যানাডা বাসী । তার সম্পর্কে জেনে আমি এই পদ্ধতি অনুসরন করি । ওর অনেক বই আছে এই বিষয়ে ।

মধুমেহ রোগে কার্বস্ কম খেতে হয় । আর সব খাবার হিসেব করে খেলে অসুবিধে নেই । ভ্রমণে বার হলে আমি তিনবার খেয়ে ফেলি । নাহলে বাসায় দুবার খাই । লাঞ্চ ও ডিনার । তাও হাল্কা । আর নন ভেজ্ প্রায় খাই না । রেড মিট কম খাই । মাছ বেশি খাই । শাক সবজি বেশি খাই তাও বেকড্ । এখানে মধুমেহ রুগীর জন্য স্পেশাল আলু মেলে । সেগুলি খাইনা । বেগুনি আলু খাই যা জেনেটিক্যালি মডিফায়েড নয় । এগুলি

বিশেষ আলু যা এসেছিলো দক্ষিণ আমেরিকা থেকে । তাই গরুর রোস্ট না খেয়ে আমি স্যালাড খেলাম । কত্তা খেলেন মাংস ফাংস । পুরুষ সিংহ বলে কথা । আর পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নইলে গ্লোবট্রটারের খরচ বাড়ে । আমরা সামান্য বাঙালী , সৌদি আরবের প্রিন্স তো নই যে কুবেরের ধন আছে মোদের !

সন্ধ্যায় পৌঁছালায় ব্যালারাটে । কিছু ক্যাঙারুকে সরিয়ে মোটেলে প্রবেশ করলাম । পথে খাবার কিনে নিয়েছিলাম রাতে সেসব খেলাম । ঘুমের দেশে পাড়ি দেবার আগে অনেকদিন পরে শার্লক হোমসের একটি বই নিয়ে বসলাম । কে জানতো পরেরদিন ওরকমই এক লোমহর্ষক গল্পের কথা জানবো । আসলে পরদিন সকালে একটু ঘুরতে গেলাম মাউন্ট বানিনিওং এতে । এটা একটি মৃত আগ্নেয়গিরি । পাহাড়খানি আদিবাসীদের এলাকা ছিলো । ঘন মহীরুহ ঘেরা পাহাড় । আর অজস্র ক্যাঙারু রয়েছে । অজানা পাখিদের গানে পরিবেশ মুখর । সুন্দর একটা বুনো গন্ধ । পাহাড়ে বেশিক্ষণ থাকলে যেন শিকড় বেরিয়ে যায় !

প্রচুর গাঢ় লাল রং এর পাখি দেখলাম । একে অপরের সঙ্গে খেলছে । উজ্জ্বল পাখিরা খাবার খুঁটে খাচ্ছে ।

অনেক মানুষের ভীড় এই পাহাড়ের চূড়ায় । একটা সুবিশাল ওয়াচ টাওয়ার আছে । সেখান থেকে শহরটা

দেখা যায় । আরো দূরে অন্য টিলা এবং অনেক বাতাস এর কল অর্থাৎ উইন্ডমিল ! নিজ মনে ঘুরে চলেছে ।

এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে নাকি বহু মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে থাকেন । একটি পরিবার ঘুরতে এসেছিলো । স্থানীয় মানুষ তারা । একটি মেয়ের নাম বলিভিয়া । সে জানালো যে তার এক বান্ধবী ওখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো । আজও নিঝুম রাতে নাকি তার কান্না শোনা যায় । অনেকে পূর্ণিমা রাতে তাকে দেখেছে । হাল্কা একটি সাদা নেটের ওয়েডিং গাউন পরা মেয়ে সোপান বেয়ে টাওয়ারে উঠে যাচ্ছে । তারপরে সেখান থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ছে । রাতে এদিকে বড় একটা কেউ আসেনা । হয়ত ছেলেছোকরারা দেখেছে । অথবা কোনো নিশাচর ভ্রামণিক কিংবা ভূত শিকারি । জানিনা গল্প না সত্যি তবে পরে শহরের একটি কাফেতেও শুনলাম এমন কথা । সত্যি মিথ্যে যাচাই করিনি ।কারণ কিছু কিছু জিনিস রহস্য থাকাই শ্রেয় , হয়ত কাফের মালকিন মজা করেই বলেছেন আমাদের ক্ষ্যাপানোর জন্য কিন্তু আমি আর কোনো লজিকের সন্ধান করিনি । বোকা সেজে থেকেছি ।

এখানে দোলনের সাথে আলাপ হল । ওর বিয়ে হয়েছে এক সাহেবের সাথে । ইতালির ছেলে । অনেক আগে

তারা ইতালি থেকে এখানে আসে । বাবার মৃত্যুর পরে বেশ কষ্ট করেই নিজের পায়ে দাঁড়ায় । ছেলেটি অবশ্যি বলে ওঠে যে মাই ফাদার ওয়াজ অ্যান অ্যাস্ হোল ।

ওদের মা ওদের মানুষ করেন । আসলে বাবা ও মায়ের দেখা হয় একটি ক্রুজে গিয়ে । সেখানে দুজনে প্রেমে ভাসেন । সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে । দেহে জোয়ার আসে । পরে ওদের বড় ভাই জন্মায় । শেষকালে অনেক পরে বাবা ও মায়ের আবার দেখা হয় এবং বিয়ে । কিন্তু বাবা ছিলেন ছন্নছাড়া মানুষ। পেশায় শিক্ষক । পয়সা জমিয়ে দুনিয়া ঘুরতেন আর বই জমাতেন । সংসার দেখতেন না কিন্তু ঘর ভরা ছেলেপুলে ছিলো । এদেরই একজন ছেলের সাথে বাঙালী মেয়ে দোলনের বিয়ে হয় ।

কিন্তু মজার ব্যাপার ওরা একটি অ্যাফ্রিকান খাবার দোকান চালায় সাথে হোম স্টের ব্যবস্থা আছে ।

দোলন সেখানে বাঙালী রান্নাও দেয় । ছেলেটির অ্যাফ্রিকান খাবারের নেশা আছে । সেসব দোকানে পাওয়া যায় । লোকে ঝাঁপিয়ে পড়ে খায় । খুব নাকি ভীড় হয় । আর হোম স্টেতেও উৎসবের সময় লোক থাকে । অস্ট্রেলিয়াতে বাঙালী খাবার বলতে ইস্কনের কাফে আর বাংলাদেশী হোটেলগুলো আছে কিন্তু দোলন খাঁটি কলকাতার খাবার দেয় নাকি । তবে স্পেশাল বাংলার খাবার নামে কিছু মেলেনা ।

ঐ ডাল ভাত সব্জি কুমড়োর কারি ভেটকির কারি (বারামুন্ডি মাছ) এসব রূপে পাওয়া যায় তবে স্বাদে আমাদের কলকাতার খানা একদম । আর ফুচকা মেলে । ঐ ইতালির ব্যাক্তি ওকে বলেন , ফুস্কা ।

দোলন তেঁতুল জল বানিয়ে , আলু সেদ্ধ করে মেখে টেখে একাকার !

এই ছেলেটির মা , সে ও মিস্ত্রীরা মিলে একটি ভগ্ন বাড়ি কিনে সেটাকে একদম ফার্স্ট ক্লাস একটি মহল বানিয়ে তাতে থাকে । বাসাটি নাকি একেবারে ভেঙে চুরে ভৌতিক নিবাস হয়েছিলো পথের ধারে । সেখানে মেঠো ইঁদুরেও যেতোনা । একদম প্রায় মাটিতে মিশে ছিলো । কিন্তু এই ব্যাক্তি সেটা কিনে নিয়ে মনে হয় সরকারের কাছ থেকে , তাকে রং করে , কাঠ ফাঠ লাগিয়ে পুরো ঝকঝকে করে এখন থাকে ।

সত্যি আমাদের ফটো দেখালো মোবাইলে । চেনাই যায়না পুরনো ভাঙাচোরা আর নতুন বাড়ি দেখে যে কোথার থেকে কি হতে পারে ।

খুব হাসছিলো দোলন । এখানে পড়তে আসে কম্পিউটার নিয়ে । কিন্তু চাকরি সেরকম নেই । তাই বদলে অ্যাকাউন্টিং এতে চলে যায় । এখন পার্ট টাইম কাজ করে ও স্বামীর কাজে সাহায্য করে । মেয়েটি বলে

ওঠে , এখানে পড়তে এলে জীবন খুব কঠিন । নিজেকে সব কাজ করতে হয় । দেশে তো কাজের লোক থাকে । আর মাথার ওপরে বাবা ও মা থাকেন । তাছাড়া ছেলেরা ডেটিং এর জন্য ব্যস্ত করে তোলে ।

ফ্রি-সেক্স চায় । নানান ঝামেলা । তাই আমি এই লোকটি মানে ওর স্বামীর সঙ্গে জুটে গেছি । এর আগে লোকটির কয়েকটি সঙ্গিনী ছিলো । কেউ টেঁকেনি কারণ লোকটি কন্ট্রোল ফ্রিক্ । কিন্তু দোলনের সেরকম কিছু মনে হয়নি কারণ আমরা ভারতীয় মেয়ে তাই আমরা এগুলোতে অভ্যস্ত । যেমন বুক খোলা জামা পড়বে না কিংবা বেশি মদ খেয়েনা, অতিরিক্ত জুয়া খেলোনা ইত্যাদি । ভালই আছে মিলেমিশে এখন । বলি , ভারতে যাওনা ?

বলে, কয়েকবার গিয়েছি । এখন আর যাইনা । অনেকদূর । প্লেনে বসে কোমড় ধরে যায় । আর ওর বর ইন্ডিয়াতে যেতে চায়না । বলে প্রতিটা লোক ঠকানোর জন্য বসে আছে । তাই । জানিনা আর যাবো কিনা । তবে আমার স্বপ্নের দেশ গ্রীসে যাবার ইচ্ছে আছে । একজন গ্রীক মেয়েকে একবার দেখেছিলাম আমাদের এখানে এসেছিলো । ওকে ছুঁয়ে দেখলাম । আহা কি সুন্দর ! মনে হল স্বপ্নকে স্পর্শ করছি । কোনো জন্মে আমি মনে হয় গ্রীসে ছিলাম ।

দোলনের মানসিক দোলনের থেকে দূরে যেতে যেতে আমরা আবার পাড়ি দিলাম সুদূরে । এবার গেলাম মাউন্ট গ্যাম্বিয়ারের পথে । সুচারু পথ পার হয়ে সুদৃশ্য স্থান ।

একটা অপরূপ লেক দেখলাম । গাঢ় নীল জল । ওটা নাকি ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে রং বদলায় । কখনো গাঢ় নীল তো কখনো ধূসর । ওর নামকরণ তাই হয়েছে **ব্লু লেক** । সাউথ অস্ট্রেলিয়া রাজ্যে এই জায়গাটি , অপূর্ব । অনেক কিছুই দেখবার আছে ।

এখানেও মৃত আগ্নেয়গিরি আছে । পানীয় জলের প্রাকৃতিক ধারা আছে যা স্বাস্থ্যকর । স্থানীয় আদিবাসীদের সাথে বহুবছর আগে সাহেবদের পশু নিয়ে ঝামেলা হতো । মারপিট ও লাঠালাঠি চলতো । সাহেবরা পশুপালন করতে শুরু করলে লোকাল মানুষ তাই নিয়ে সমস্যা করতো । এইসব নানান কারণে আদিবাসীদের মেরে পুড়িয়ে দেওয়া হতো । পরে সমস্ত মিটে একটি সভ্যতা গড়ে ওঠে । তাই নিয়েই আজকের মাউন্ট গ্যাম্বিয়ার ।

এখানে আলাপ হল ভানুমথির সাথে । কেরালা থেকে এসেছে । স্বামী লোকাল কোনো সংস্থায় কাজ করে ম্যানেজার হিসেবে । বললো যে দেশে থাকা যায়না ।

রাজনৈতিক ঝামেলা আর অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য এখানে চলে এসেছে ।

ভানুমথি (ভানুমতী) নাকি ব্যাকওয়াটার্স এর দিকে কোথাও থাকতো । আমি বলি পিছুটান ।

সেখানে ওদের বাসা একেবারে নদীর ধারে । ও নাকি নৌকো করে সব জায়গাতে যেতো ।

বাড়িতে বাজার আসে নৌকো করে , মাছের দোকান আসে নৌকো করে । ফুল নিয়ে আসে নৌকো করে । এমনকি কি সুপার মার্কেটে কিংবা শিশুরা স্কুলে কিংবা বর অফিসে গেলেও নিজের গাড়ির বদলে নৌকো বেয়ে চলে যায় ।

ভানুমথির নিজের একটা ছোটো নৌকো ছিলো ।

সেটা করে শিশুদের স্কুলে দিয়ে আসতো । আবার দরকার হলে সেটা বেয়েই দোকান থেকে কিছু কিনে আনতো । ভারি মজার তাই না ?

আমরা ব্যালারাট থেকে আসছি শুনে বললো যে ওখানে নাকি কিছু ট্রাউট ফার্ম আছে যেখানে নিজেরা মাছ ধরা

যায় এবং তাদের প্যান্ট্রি আছে সেখানে দিয়ে দিলে ওরা রান্না করে কিংবা ভেজে দেয় । দারুণ ব্যাপার তাইনা ? টাটকা মাছ ভাজা খাওয়া এক লোভনীয় জিনিস । ছোট ছোট বাচ্চারাও মাছ ধরতে সক্ষম । ইয়া বড় বড় জাল নিয়ে যা চায়ের ছাকনির মত, সেগুলো জলে চুবিয়ে মাছ ধরছে তারা ঐ মেছো ফার্মে বলে জানা গেলো ।

পরেরবার গেলে ওদিক পানে যাবো প্রতিশ্রুতি দিলাম ।

আমি এখানে মানে আমার শহর ক্যানবেরায় অনেক বনজঙ্গল ও পাহাড় আছে সেখানে পিকনিকে যাই । একবার কাঠের মরা আঁচে ছোট ছোট মাছগুলো যা কাছের নদী থেকে ধরা তাই কলাপাতায় মুড়ে, পুড়িয়ে তাতে নানাবিধ সুস্বাদু সস্ ঢেলে খেয়েছিলাম । সেই কথা মনে হল । এখানে যেদিন আমার রান্না করতে ইচ্ছে করেনা সেদিন আমি গুরুদ্বোয়ারায় লঙ্গর খেয়ে নিই । আমার বাড়ির খুব কাছে আছে ঐ পুণ্যস্থান ।

মাউন্ট গ্যাম্বিয়ারে একটি থাই রেস্তোরাঁতে রাতের খাবার খেলাম । থাই ফুড আমার বিশেষ প্রিয় । ওদের থাই গ্রিন কারি ও রেড কারি খুব ভালোলাগে । ভালো লাগে নারকেলে রান্না করা চিকেন ও বাঁশের স্বাদ ।

এক সাহেব বন্ধু থাই রমণীকে গৃহিনী করেছিলো মেয়েটিকে নয় , থাই ফুডকে ভালোবেসে ।

তাই আমিও এগুলি চেটেপুটে খেলাম জীবনকে উপভোগ করার মতন । এবারে কোভিডের জন্য কিনা জানিনা পথেঘাটে লোকজন কম । উৎসব হলেও । অস্ট্রেলিয়া, কোভিডে অন্যান্য দেশের থেকে অনেক ভালো করেছে । তবুও মানুষজন অনেক কম । আমাদের ক্যানবেরাকে লোকে স্বর্গ বলতো । কারণ পুরো অস্ট্রেলিয়াতে মুখোশ নাচ অর্থাৎ পুরুলিয়ার ছৌ নাচ চললেও ক্যানবেরাতে আমরা মাস্ক ছাড়াই ঘুরেছি কতকাল । **এখানে ভ্যাকসিন বিরোধী মানুষও আছেন অনেক । তাদের মধ্যে কয়েকজনকে চিনি । তারাও কেউ মৃত নন আজও ।**

একের পর এক উৎসব পেরিয়ে যায় একাকিনী এখানে আমি । বহু বছর তো দেশে যাওয়া হয়নি । সবই আন্তর্জালে দেখি । অমৃতের স্বাদ লস্যিতে মেটাই ।

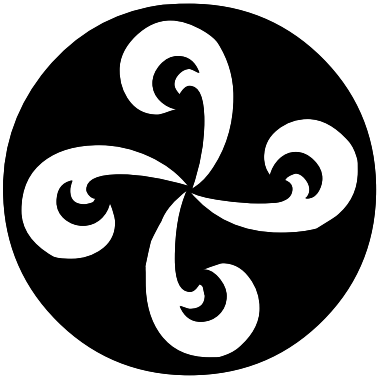

এরপরের গন্তব্য যশ । বাংলায় এমনই মধুর নামখানি হবে । তবে ওদের ভাষায় নামটি হল য়্যাশ ।

যশোবর্দ্ধন, যশোমতী কিংবা যশোধরা নামগুলি কি সুন্দর না ? আমার মনে হয় ।

এখানে আলাপ হল পোকা বিশারদ বাঙালী মেয়ে আশাবরীর সাথে । কুমারী মা । বিদেশে আসে গবেষণা করতে । সহকর্মী একটি মুসলিম যুবক ওকে মা করে দিয়ে আত্মহত্যা করে । কারণ ওদের পরিবার এই বিয়ে মেনে নিতে রাজি নয় । সেই আশাবরী আছে সন্তান আর পোকা নিয়ে । তার বাড়ি ভর্তি পোকা ।

নানান প্রজাতির কেঁচো , কেন্নো , ক্রিকেট ইত্যাদি কিলবিল করছে ওর একটি বিশেষ ঘরে ।

বলে , ওরা আমার নয়ণের মণি ।

যাকে ভালোবেসেছে অথচ বিয়ে হয়নি তার নামটি ছিলো ইমাদ । আশাবরী বলে চলে , খুব ভেঙে পড়ি ওকে হারিয়ে । আমরা একে ওপরের সোলমেট ছিলাম

। ইনসেপারেবেল । ভাবিনি কোনোদিন এইরকম একলা হয়ে যাবো । আচ্ছা মানুষ এত জাত, ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় কেন? সবার রক্তই তো লাল ! হ্যাঁ , কালচার হয়ত ডিফারেন্ট কিন্তু সেটা তো প্রেম দিয়ে , কম্প্যাশান দিয়ে ভরিয়ে তোলা যায় । ব্যাপারটা সম্ভব । আর দেখুন না ওকে হারিয়ে আমি এমন অসহায় হয়ে গেছিলাম যে আমারও প্রায় অবসাদ রোগে ধরে আরকি । কিন্তু ছোট বাচ্চাটার জন্য বাঁচতেই হবে । ওকে কে দেখবে ? কি হবে ওর ? সমাজে একজন বাস্টার্ডের কি বা মূল্য ? তাই আমি থেকে যাই । তখন আমাকে সাহায্য করে , হিল করে এই পোকাগুলোই ।

ওরা দেখতে এইটুকু কিন্তু ক্ষমতা অসীম । মশার কথা ভাবুন একবার । ওর সাইজ দেখে ওর ক্ষমতাকে আপনি ইগনোর করতে পারবেন কি ? সেরকম ।

ভীমরুল কামড়ালেও একই হাল । তবে এরা আমার উপকার করছে । এদের দেখে আমি শিখেছি যে কত কম জিনিস নিয়েও বেঁচে থাকা যায় আর আনন্দে থাকা যায় ।প্রতিটি মানুষের জীবন একটি বৃত্ত । সেটা বড় না ছোট তার তুলনা করা আমার কাজ নয় । আমার কাজ বৃত্তটা পূর্ণ করা । তবেই আমি জীবনে সুখী হতে পারবো । **ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকার দল আমাকে এগুলি শিখিয়েছে ।**

ওর কয়েকটি ব্যাঙও আছে। সেগুলি খুব ক্লেভার।

যশে আছে অনেক আঙুর ক্ষেত। সবুজ, সতেজ এই ক্ষেতের সাথে লাগোয়া কাফেতে ওয়াইন চেখে দেখার ব্যাবস্থা আছে। আছে প্রচুর আলপাকার ফার্ম। সবুজের সমারোহের মাঝে আলপাকার আদর উপভোগ করা চলে।এদের লোম দিয়ে ভেড়াদের মতন নানান জিনিস তৈরি হয়। সেসব বিস্তারিত জানা যায়। রং বেরং এর আলপাকাকে জড়িয়ে ধরা যায় আর সেল্ফি নেওয়াও যায় তাদের সাথে। দূরে ঘুম পাহাড়ের হাতছানি। সে শুধুই ঘুমিয়ে আছে। আছে অজস্র আঙুর ফুলের বাহার। চারদিকে। মহুয়া নয় আঙুরের নেশায় মাতাল ভ্রামণিকেরা। উত্তাল আলপাকারা, দুপেয়ের সান্নিধ্যে। তবে ওরা নাকি মাঝে মাঝে অ্যাটাক করে। ক্ষেপে গেলে। বড়ই মুডি তারা।

একটি অপূর্ব, দৃষ্টিনন্দন গুহা আছে। নাম তার ক্যারিজ কেভ। চুণাপাথরের তৈরি। আমি বলি লেবুপাথর। (লাইমস্টোন) কারণ লেবু বললেই সুন্দর গন্ধরাজের সুগন্ধ এসে নাকে লাগে। তখন মনে মনে আমি গরম গরম মুসুর ডালে গন্ধরাজ লেবু টিপে ভাত খাই কোনো ভাজা দিয়ে। আমি আবার খাবারের সম্পর্কে পড়লে মনে মনে কিংবা বানিয়ে না খেলে

শান্তি পাইনা । এই গুহাটি দেখলে মনে হবে কোনো শিল্পীর করা কাজ । এর ভেতরে নানান ফাংশান হয় । বিয়েশাদি হয় । মনে হল কাছেই একটি কাফেও আছে । এগুলি শুনলাম নূরের কাছে । নূর হায়দার । বাংলাদেশ থেকে এসেছিলো এখানে ।

এক বর্মি পুরুষকে বিয়ে করে অস্ট্রেলিয়াতে আসে । বর্মি অবশ্যি পরে নূরকে ছেড়ে এক স্বর্ণকেশী , পক্ক বিম্বোষ্ঠীকে গৃহিনী করে । নূর তখন অনেকদিন ওর এক বন্ধুর বাসায় ছিলো । সারাদিন শুয়ে থাকতো ।

কড়িকাঠের দিকে চেয়ে । বর্মির সাথে আলাপ হয় অফিসে কাজ করতে করতে । সে মিয়ানমার (মায়নামার) থেকে বাংলাদেশে যায় । নূর কোনো ছোটখাটো কাজ করতো । বর্মির নাকি ওদের দেশেও একটা বৌ ছিলো । পরে জেনেছে । ওর নাকি নানান দেশে গিয়ে বৌ করার নেশা আছে ।

সরকারের টাকায় চালাতে লাগে । গহনা বেচে দেয় । শেষকালে জামাকাপড় এমনকি দামী সুট্যকেস , জুতো এবং ব্যাগও বিক্রি হয়ে যায় ।

সরকারের টাকা নিতে গিয়েই আলাপ এক কর্ণকুহর আহত হওয়া মানুষের সাথে । লোকটি বোবাও ।

সেই মানুষটি একটি ফার্মের লোক । বাবা ও মা চাষী । অন্য ভাইবোনেরা চাষে নিযুক্ত । এই লোকটি পারেনা কারণ কানে শোনানা ও কথা বলতে অক্ষম তাই । এমনি চাষী পরিবারটির অবস্থা ভালই ।

লোকটি সরকারের টাকায় চালায় আর ফার্মের ছোটমোট কাজ করে । পরে নূরের সাথে ভাব ভালোবাসা হয় । লোকটির সঙ্গেই বিয়ে করে থাকে এখন নূর । খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে সে।

বলে : যেই দেশে থাকি তাদের সংস্কৃতি মেনে চলাই শ্রেয় । ফিলিপ (ওর পতিদেব) এর জন্য আমি ওর সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে নিয়েছি । খুব একটা শক্ত নয় শেখা । আমিই এখন ওর সাথে বেশি কমিউনিকেট করি ওর বাসার লোকের থেকে ।

ওরা এখন আলাদা বাসায় থাকে । নূর কাজ পেয়েছে । দুজনে মিলে কাজ করে । ছোট কোনো শপিং সেন্টারে মালপত্র গোছানো ইত্যাদির কাজ করে , প্যান্ট্রিতে রান্নাও করে । **এইভাবেই চলে যায় ।**

আমি বলে উঠি , লাভ ক্যান কন্‌কার এনিথিং !

ও হেসে জুড়ে দেয় , ইফ ক্রাইস্ট ওয়ান্টস্‌ ।

যশে এছাড়াও দেখি বুরুনজ্যাক ড্যাম । এটি নদীর ওপরে । একটি হেরিটেজ সাইট । বাঁধের জলের তাপমাত্রা এতই কম যে নদীর জলের বিড়ালমাছ (ক্যাট ফিশ) নাকি বিলুপ্ত হয়ে গেছে । জায়গাটি পাহাড়ের ধারে । সবুজ বনানী পেরিয়ে এই ড্যাম । পাখির ডাক আর অচেনা পশুর শব্দের মুখরিত পাহাড়ি সরু পথ । একদিক থেকে গাড়ি এলে অন্যদিকে গাড়ি চলা সমস্যা । বিদেশে এমন হয়না । তাই বড় আর্শি বসানো আছে যাতে দুপাশ দেখা যায় । কারণ এখানে কেউ হর্ণ বাজায় না । এদেশে, হর্ণ বাজানোকে খুব অসভ্যতা বলে মনে করা হয় । তাই অ্যাক্সিডেন্ট ঠেকাতে এগুলো করা হয় । দু-একটি পাহাড়ি ঝোরাও চোখে পড়লো বুঝি ! তবে এতই সরু যে জলরেখা প্রায় নেই ।

খাদের দিকে নদী আর অজস্র মহীরুহ । নীল আকাশ । উজ্জ্বল রোদ । বাঁধের কাছে দেখি একটি মেয়ে অনেকটা চীনাদের মতন চেহারা বসে আছে ।

নাম পুষ্পা । সে নাকি ত্রিপুরা থেকে এসেছে । একটি ক্যারাভেন মতন দোকান নিয়ে বসেছে । তাতে মোমো, ওমলেট , কফি, চা , সসেজ, চাউমিন ইত্যাদি বিকিকিনি হচ্ছে । কিছু তাজা ফুলও আছে । ট্যুরিস্টরাও নিচ্ছে । আমি এগিয়ে যাই । ও নিজেকে

ভারতীয় বলে পরিচয় দেয় । কথায় কথায় জানা যায় ও ত্রিপুরী । বলে ওদের নাকি ১৮৪ টা রাজা ছিলো । ঐ মুনমুন সেন যেই বংশে বিবাহিতা ঐ বংশের কথা বলছে মনে হয়। আমি গুগুল করিনি । ও যা বলেছে তাই লিখছি ।

ও একটা গ্রাম থেকে এসেছে । সেটা নাকি আল্পনা গ্রাম বলে পরিচিত । ওখানে সবাই বাসার গায়ে বা দেওয়ালে আল্পনা আঁকে । নানান প্রতিযোগিতাও হয় এই নিয়ে । বহুকাল ধরে এসব চলেছে । খুবই ক্রিয়েটিভ ওরা । বিশেষ করে মেয়েরা এগুলো করে ।

সবার ঘরে ঘরে, দেওয়ালে আল্পনা আঁকা ।

আবার বাংলাদেশেও নাকি এরকম একটি গাঁ আছে । নাম ছিলো আগে টিকিল । এখন লোকে আল্পনা গ্রাম বলে চেনে । ওখানে মেয়েরা আগে লাল মাটি , কলার রস ব্যবহার করে করে আঁকতো । হাত দিয়ে । পরে তুলি ও নানান রং বাজারে আসে । এখন সেগুলি কাজে লাগায় । বাংলাদেশে এই গ্রামের খুব নাম । মনে হয় হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম । নানাবিধ পুজোয় আর অন্যান্য সময় মেয়েরা আল্পনা আঁকে ঘরে ও বাইরে ।

চারুকলা দেখবার মতন । মেয়েটি মানে পুষ্পা দেববর্মা বললো , আমি নিজে সেখানে যাইনি । তবে শুনেছি যে

আল্পনা দেখবার মতন । ইচ্ছে আছে গিয়ে দেখার যে আমাদের থেকেও ভালো পারে কিনা ।

পুষ্পার গাড়িতেও সুন্দর আল্পনা দেওয়া । অপূর্ব ঘোড়া ছুটে চলেছে সেসব আঁকা রয়েছে । আবার সিন্ডেরেলার মতন কেউ বসে আছে । এইসব । নিপুন হাতের আঁকা । আর সাথে সাথে বাংলার লোকশিল্পের মতন আল্পনা দেওয়া । খুবই মনোরম ।

মেয়েটি এখানে বিয়ে হয়ে আসে। ওর স্বামী রঞ্জিৎ দেববর্মা একজন বনজ গবেষক হিসেবে আসেন । ফরেস্ট নিয়ে কাজ করতেন । এখন এখানে একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ান । মেয়েটি কিউরিও শপ চালায় । উইক এন্ডে খাবারের দোকান দিতে নানান ট্যুরিস্ট স্পটে ঘোরে । এটা ওর প্যাশান ।

মিষ্টি হেসে বলে ওঠে , দেশে প্যাশানের সুযোগ কৈ ?

এখানে খুব মজায় আছি । আমাদের বাচ্চা নেই ।

একটি দত্তক নিয়েছি । অ্যাফ্রিকান মেয়ে । নাম অ্যালেগ্রা । বয়স ওর এখন ১১ । স্কুলে পড়ে ।

খুব ছোট্ট ছিলো যখন ওকে আনি ।

আমার স্বামীর প্যাশান হল সাপের চামড়া কালেক্ট করা । এটা ও করে বেড়ায় । আর আমার মেয়ের হবি হল

স্যান্ড আর্ট । হয়ত আল্পনার প্রতিভাটা আমার থেকে পেয়েছে । এখানে বালি শিল্প নিয়ে শিক্ষা নিচ্ছে ও ।

বালি দিয়ে ভাস্কর্য গড়ার কাজ শিখছে ।

ওর কথায় মনে পড়লো আমি মেলবোর্নে থাকতে ফ্র্যাঙ্কস্টনে গিয়েছিলাম এরকম একটি প্রদর্শনী দেখতে যেখানে শুধুমাত্র বালি দিয়ে দিয়ে আইফেল টাওয়ার , বাকিংহাম প্যালেস, অসাধারণ সিনিক সমস্ত দৃশ্য বা নানা প্রোডাক্ট কিংবা মানুষের মূর্তি তৈরি করে দেখানো হচ্ছিলো , **মনে হল পুষ্পা দেববর্মা তারই কথা বলছে ।**

ওকে বিদায় জানিয়ে হেঁটে গেলাম ড্যামের দিকে । দেখি নদীতে অনেক নৌকো চলেছে । বেশিরভাগ প্রাইভেট ছোট ছোট নৌকো । কোনোটা স্পিড বোট ।

ঝিরিঝিরি হাওয়া দিচ্ছে । প্রকৃতির কাছে এলে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় । একটু নৈঃশব্দের ছোঁয়া লাগলে মনটার ভেতর থেকে কতনা আনন্দ জেগে ওঠে । প্রচন্ড ভীড়ে নাভিঃশ্বাস ওঠা জীবন থেকে যা হারিয়ে গেছে ।

যশে আছে রেলগাড়ি মিউজিয়াম । আমি দেখিনি । কুমা কটেজ নামক একটি বহু পুরানো বাসা আছে । হেরিটেজ সাইট । আগে টিবি রুগীর নিবাস ছিলো । সে অনেক আগে । ১৮৩০/৩৭ নাগাদ । একটি অতি প্রাচীন অলিভের ন্যায় বৃক্ষের ছাপ আছে । নাম পিক্কোনিয়া । যা কিনা ক্যানারি দ্বীপ অর্থাৎ ওর জন্মভূমিতেও বিলুপ্ত হয়ে গেছে ।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম বিদেশীরা কিরকম ভাবে বসবাস করতো তার উদাহরণ এই বাড়িতেও দেখা যায় ।

হাতে তৈরি ইট , কাঠের কারুকার্য ইত্যাদি দেখে মজাই লাগে । এত পুরনো কিন্তু ঐতিহ্যে উজ্জ্বল ।

মালবেরি, অ্যাপ্রিকোট গাছ নাকি আছে ।

মালিকের পরে এই কটেজ টিবি স্যানিটোরিয়াম হয় আর আরো পরে ঘোড়ার আস্তাবল ।

পরে আরো অনেক কিছুই হয়েছে ।

আজও কান পাতলে মেমভূতের নূপুরের ধ্বনি শোনা যায় হয়ত ---**আমি যার নূপুরেরও ছন্দ , বেণুকার সুর --- কে সেই সুন্দরও কে এ এ এ ??**

গেয়ে চলেছে সাদা গাউন পরা কায়াহীনা কোনো ফিউশান প্রেতিনী !

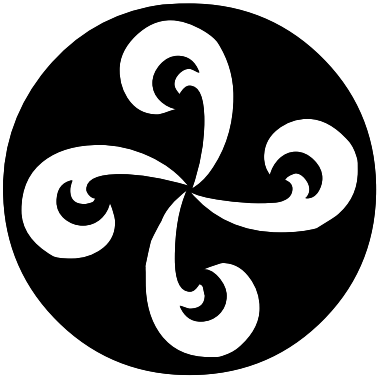

অস্ট্রেলিয়ায় চা বাগান বড় একটা নেই । দার্জিলিং কিংবা আসাম অথবা উটির মতন । কিন্তু টি-গার্ডেন নামক একটি স্থান রয়েছে । তবে শুনলাম যে মাদুরা বলে আমরা একটি কোম্পানির চা খাই সেটার নিজস্ব চা বাগান এই দেশেই অবস্থিত । মাদুরার অর্থ নাকি স্বর্গ । দক্ষিণ গোলার্ধের সবচেয়ে আধুনিক চা প্যাকিং কোম্পানি হিসেবে পরিচিত এরা ।

অস্ট্রেলিয়াতে আগে আদিবাসীরা চায়ের মতন এক পানীয় খেতো যা অন্য কোনো গাছ থেকে সৃষ্ট । **একে মানুকা বলা হতো । এখন একেই টি ট্রি বলে ।**

মাদুরা যেমন শ্রীলঙ্কার দুই মানুষের সৃষ্ট চা বাগান সেরকম আরেকটি আছে তার নাম নেরাদা টি । এরা সুবিশাল । এছড়াও অজস্র ছোট বড় বাগান বিদ্যমান । তবে দার্জিলিং এর কাছে কিছু না । অনেকে আবার নিজের বাসায়ও চা গাছ গজিয়ে চা বানায় ।

এরকমই একজন মল্লবীর । শ্রীলঙ্কার মানুষ । সীসার মতন কালো গাত্রবর্ণ ।

বৌ মোমের মতন সাদা । গায়ের রং এতই উজ্জ্বল । পতিদেবের বিপরীত । আর চামড়া দেখে মনে হয় যেন স্বচ্ছ কাঁচের মতন । এতই মসৃণ । এদের বাসায় নাকি এরা ব্যাঙ পোষে । লোকে কুকুর , বিড়াল পোষে । আর এরা ব্যাঙ পোষে । **তাদের দেখতে পুরো কার্টুনের ব্যাঙের মতন । আকাশী ও কালো এবং হাল্কা সবুজ ও হলুদ নক্সা কাটা অথবা অন্য কোনো রং তাদের অর্থাৎ মহাখুশীতে বিরাজমান সেসব ব্যাঙ আসলে যেন ব্যাঙরূপী কোনো রাজকুমারী ।** আগে এক পোকাবিশারদকে চিনেছি যার বাসায় পোকার সাথে সাথে ব্যাঙ-ও ছিলো তবে এরকম রং বেরং এর মনে হয় নয় তারা ।

তাদের স্বভাবও মজার । মালিককে ফোক্‌লা দাঁতে কামরাতে ওস্তাদ ! মালিক একজনকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে ফেললে অন্যজন লাফিয়ে এসে তাকে সরিয়ে দেয় রীতিমতন ঠেলে আর মালিকের কোল মানে হাত জুড়ে বসে । অন্যজনকে একদম যুদ্ধের কায়দায় আক্রমণ করে ফেলে দেয় । ওদের খাদ্যগুলো দেখলে মনে হবে ওদের বিষ্ঠা । এতই কদর্য আকারের সেগুলো ।

কিন্তু ওরা খুব বন্ধুত্বপূর্ণ । মিলেমিশে থাকে ।

এদের মালিকের কাছেই শুনলাম যে সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাডেলেডের দিকে একটি স্থান আছে যার নাম কুবার পেডি । সেটা অনেক সময় দুনিয়ার ওপাল ক্যাপিটাল হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে ।

এখানে নাকি মাটির নিচে শহর আছে ।

একে ডাগ আউট বলে । জায়গাটি খুব গরম জায়গা । তাই এরকম ব্যবস্থা । এখানে গাছগাছালি খুবই কম কারণ বৃষ্টি প্রায় হয়না । মরু ধরণের এলাকা । পাথুরে

মাটি আর জলের ব্যবস্থা খুবই কম । লোকজন তাই পাহাড়ের নিচে গর্তের গুহায় থাকতো ।

এইভাবেই শহর গড়ে ওঠে ।

দেখার বলতে আছে অজস্র খনি । মাটির নিচের গীর্জা,

মোটেল এগুলিও দেখার । এসব মোটেলে লোকে থাকে । গল্ফ কোর্সে নাকি ঘাস নেই বিন্দুমাত্র । রাতে খেলা হয় তাপ থেকে বাঁচতে । চোখে ঝিলমিল লাগা বল ব্যবহার করা হয় ।

আদিবাসী শিল্পীদের জন্য শিল্প ক্ষেত্র আছে ।

কেবলমাত্র ডট আর লাইন দিয়ে এরা চিত্রগুলি আঁকে । সরল নক্সা কিন্তু ভারি সুন্দর । যেহেতু খনি শহর তাই মাটির নিচে অনেক গহনার দোকানও আছে । আছে কাফে, অনেক ছায়াছবিও নাকি চিত্রিত হয়েছে এখানে ।

এই সমস্ত তথ্যই আমি শুনলাম ঐ মল্লর কাছে । নিজে কিন্তু যাইনি । আবার এমনও শুনলাম যে মল্লবীর ওদের বাসায় মূর্গী পোষে । আর ছাগল পোষে । ছাগল নাকি খুব বুদ্ধিমান পশু । আমরা বোকাদের ছাগল বলে অভিহিত করতে অভ্যস্থ কিন্তু আসলে ওরা খুব চালাক হয় ।

তো কোনো কোনো চাঁদনী রাতে মল্লবীর ওর বন্ধুদের নিয়ে বাড়ির কোনো মূর্গীর গলা ঘ্যাঁচাং ফুক্ করে কেটে ফ্যালে । তারপর বাসার পেছনের বাগানে পুরনো ইটের বড় চুল্হায় সেই মূর্গী দিয়ে রান্না করে ইরানী কায়দায় মোরগ পুলাউ ।

বলে ওঠে, ওরা অনেক কিছু দেয় যা আমি দিইনা আবার আমি অনেক কিছু দিই যা ওরা দেবেনা ।

যেমন আমি কারি পাতা দিই আর ওদের মতন এত ড্রাই ফ্রুটস্ দিইনা ।

আমি ফাজলামো করে বলে উঠি , তা নারকেল দাওনা ? গোটা গোটা করে কেটে ?

ও দাঁড়িতে হাত রেখে বিজ্ঞের মতন হেসে বলে, হ্যাঁ তা মাঝে মাঝে দিই বইকি !

ওর দাঁড়িটা নকল । যুবকের সাদা দাঁড়ি । বলে, শেভ করতে না ইচ্ছে করলে নকল দাঁড়ি পরে নিই ।

আমি আর না হেসে পারিনা ।

মনে মনে ভাবি পুলাউ তাও নন ভেজ, গোটা গোটা নারকেল দিলে সেটা কেমন হবে তা কল্পনা না করাই বোধহয় শ্রেয় । আমরা বাংলার লোক পুলাউ মানে বুঝি মিষ্টি । **আমার অতীব কল্পনা প্রবণ মনে সদা সর্বদা কল্পনার ঢেউ চলে । যাতে কাছের মানুষ বলে থাকেন যে আমি রিয়েলিটিকে প্রায়শইঃ বেন্ড করে ফেলি । আর কোনো মানুষ দেখলেই মনে মনে তাকে নিয়ে গল্প ফাঁদতে শুরু করি ।** কাজেই এটা না বলার কোনই কারণ নেই আবার বলার সেরকম কোন যুক্তিও নেই । তবু শেষে লোভ না সামলাতে পেরে সেই রিয়েলিটি বেন্ড করলামই ! বলে উঠি , আমরা বেঙ্গলিরা এই পুলাউকে চিকেন পুলাউ বলি আর তুমি যা রেসিপি বললে প্রায় সেরকমই করি আর শেষে একগাদা বড় বড় রসগোল্লা বলে এক ধরণের জুসি কেক পাওয়া যায় এইরকম ছোট ছোট বলের মতন সেগুলো দিয়ে দিই ।

ও তাজ্জব হয়ে বলে ওঠে, বলো কি ?

আমি, হ্যাঁ সেরকমই ।

-তাহলে খেতে কেমন হবে ?

-খেয়ে দেখো ।

-এটা কি চিকেন পুলাউ সত্যি ?

আমি খুব হাসি এবার । তারপর বলে উঠি , হ্যাঁ এর নাম চিকেন স্যুইট চিলি পুলাউ । বেঙ্গলিরা খুব খায় । কাউকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই জোরে হাঁটা লাগাই অন্যদিকে ।

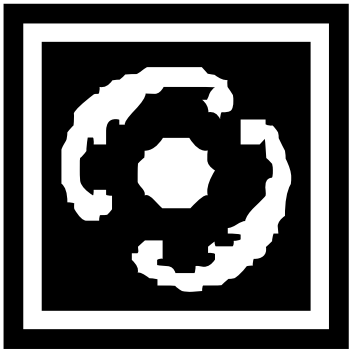

ক্যানবেরা শহরের অনতিদূরে আছে কুমা । পাহাড়ি শহর । শহর না বলে ছোট জনপদ বলা বোধহয় ভালো । এরই কাছে আছে স্নোয়ি মাউনটেন । অস্ট্রেলিয়ার সবথেকে উচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট কোজিস্‌কোহ্‌ এখানেই অবস্থিত । এখানে স্নো হয় । লোকে **স্কি** করতে আসে । আমি এদিকে প্রায়ই ঘুরতে আসি । এখানে কুমা শহর থেকে দূরে আছে সুন্দর একটি রিসর্ট । ওখানে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন করতে যাই । মাছ ধরি ওদের লেকে । আশেপাশে পাহাড়ি পথে হেঁটে বেড়াই ।

ভলি বল খেলি । ভালোলাগে । ইচ্ছে মতন নাচি । গান চালিয়ে । পর্বতের সবুজাভায় । আমি প্রকৃতির সন্তান । তাই গাছের বুনো গন্ধ আর ফুলের মায়াজাল আমাকে বেশি টানে । আমি যদি কাউকে জন্মদিনে একটি লাল ফুলে ভরা রডোডেনড্রন গাছ উপহার দিই আর সে বোঝে তার মূল্য তাহলে তাতেই আমি বেশি খুশি হই । কেউ যদি আমি বিয়ের সময় ডায়মন্ড উপহার না দিয়ে চন্দন কাঠের ইউনিক বাক্স উপহার দিয়েছি দেখে

খুশি না হয়ে নিন্দে করে তাহলে তাদের মুখের ওপরে আমি দরজা বন্ধ করে দিতে একটুও সময় নিই না।

কারণ আমি জীবনকে সময় দেওয়া , মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া এগুলো শিখেছি। আমার কাছে কে কালো, কে ফর্সা কাকে কেমন দেখতে কে গরীব কে ছোটলোক কে ভদ্রলোক এগুলো তত বড় নয়। কে কি করতে পারে কে কি করে দেখাতে পারে কার মন কত আয়না কার আত্মা কত শুদ্ধ এগুলো বেশি গুরুত্ব পায়।

এই রিসর্ট একদম নেচারকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। পয়সাওয়ালা মানুষের ঠিকানা হলেও ওটা নিজেকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

নিঝুম পরিবেশ , অচেনা পাখির কলকাকলি আর বয়ে চলা পাহাড়ি ঝোরার এক সুরে গান যেন দেহ থেকে মনের আদিমতাকে জাগিয়ে তোলে।

এখানেই আলাপ হল মানসীর সাথে। সে ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার। এই পরিবেশ ও পাহাড়ের সামিট্ নিয়ে ছবি করবে বলে এসেছে।

আগে রিসার্চ করে নেবে। পরে ক্রু নিয়ে আসবে। **মানসী বনহরিণী ; এই ওর পুরো নাম।** আসল নাম নাকি মানসী তালুকদার। বদলে এমনটা করে ফেলেছে। আমি এখান থেকে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম সেই

কথা তাকে বললাম । এখানে তালবিঙ্গো বলে কাছেই আরেক জায়গা আছে । সেখানে অস্ট্রেলিয়ার এক প্রখ্যাত লেখিকার বাড়ি ছিলো । ওঁর নামেই অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয় ×মাইলস্ ফ্র্যাঙ্কলিন অ্যাওয়ার্ড । আসল নাম স্টেলা মারিয়া সারা মাইলস্ ফ্রাঙ্কলিন ।

শর্টে মাইলস্ ফ্রাঙ্কলিন । উনি একজন নারীবাদীও ছিলেন । ওর কোনো পূর্বপুরুষ অস্ট্রেলিয়ায় আসেন কনভিক্ট হিসেবে । সারাটা জীবন সাহিত্যের কাজে জড়িত ছিলেন । ছোট পত্রিকাকে সাহায্য করা , লেখকদের ও তাদের সংস্থাকে নানারকমভাবে সাহায্য করে উনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন ।

ওঁর নামে মাইলস্ ফ্র্যাঙ্কলিন অ্যাওয়ার্ড হলেও এবং উনি নারীবাদী হলেও খুব কম নারীই এই পুরস্কারে পুরস্কৃত । তাই পরে স্টেলা প্রাইজ সৃষ্টি করা হয় । যা কেবল নারীরাই পাবেন । কারণ দেখা গেছে যে মেয়েরা সাহিত্য পুরস্কারে বঞ্চিত । তাদের বইও কম রিভিউ করা হয় এবং তাদের দিয়ে বই খুব কম রিভিউ করানো হয় ।

এই লেখিকার জন্মের আগে তাঁর মা এই পাহাড়ি এলাকায় কোথাও থাকতেন । হয়ত কোনো ফার্মে । সেখান থেকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে করে

মায়ের কাছে যান দূর্গম পর্বত পেরিয়ে । তখন নাকি এইসব এলাকায় কেবল কিছু আদিবাসী পথ পেরিয়ে এদিক ওদিক যেতো । সেইসময় উনি সন্তানের জন্ম দিতে এতটা রিস্ক নেন । তাই আমরা এতবড় একজন মানবীকে পেয়ে যাই । স্টেলার বহু অনুরাগী থাকলেও উনি কাউকেই বিয়ে করেননি ।

ওঁর নামে স্কুল, একটি সাবার্ব ইত্যাদি আছে । বিভিন্ন ধরণের কাজ করেছেন । বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ওঁর জীবনের ঝুলি । তাই দিয়েই সৃষ্টি করেছেন মনের ক্যানভাসে নানান বিমূর্ত চিত্র । নিপুন তুলিরেখায় ।

কিন্তু ওঁর জীবনেও অনেক হতাশা, একাকীত্ব ছিলো । সেসব ওঁর সম্পর্কে পড়লে জানা যায় ।

তালবিঙ্গোকে উনি ভালোবেসেছিলেন । এই একটি স্থান ছিলো ওঁর নিবিড় ভালোবাসা ও উষ্ণ স্মৃতির ।

নিজ পরিবারের মানুষের কাছে ছিলেন প্রডিজি তাই বিশেষ স্নেহ পেয়েছিলেন যা চিরটাকাল মনে রেখেছেন । অসময়ে যা মলমের কাজ করেছে ।

কোনো মানুষকে ভুলতে গেলে তার সাথে কদর্য মূহুর্তগুলো বার বার মনে করতে হয় সেরকম কোনো ব্যাথা ভুলতে গেলে জীবনের মধুর ক্ষণগুলোকে মনের

মণিকোঠায় প্রস্ফুটিত করতে হয় । হয়ত স্টেলা সেরকম করেই কেল্লা ফতে করেছেন , কে জানে ?

ꕥꕥꕥꕥꕥꕥ

এরপরের ঠিকানা বিচওয়ার্থ অ্যাসাইলাম । এটা ভিক্টোরিয়া রাজ্যে । আমাদের পাশের রাজ্য । এই রাজ্যের রাজধানী মেলবোর্ন । আমরা আগে মেলবোর্নে থাকতাম । এখন ক্যানবেরায় থাকি ।

বিচওয়ার্থ একটি উন্মাদ আশ্রম ছিলো । নগ্ন রুগীর মেলা । এখন কেউ থাকেনা তবে অস্ট্রেলিয়ার সবথেকে ভয়াল ভৌতিক কার্যকলাপের জায়গা এটি ।

এরকমই শুনে এসেছি । আমার পতিদেব সাথে ছিলেন । আমরা একটি মোটেল ভাড়া করে এসেছি । সেটা ভালই-- বেশ পুরনো ভিক্টোরিয়ান একটা ছাপ আছে ।

ঝকঝকে কার্পেট । গাঢ় লাল রং । মখমলের মনে হল । সাদা ধবধবে বিছানা । মোমের মতন ।

নিজেকে রাজা টাজা মনে হচ্ছে ।

বোধহয় ফায়ারপ্লেস ছিলো একটা । রাতে সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিয়ে গেলো । বললো এটাই নাকি ওদের নিয়ম

। বড় বড় মোমবাতি জ্বালানো হল । নানান আকৃতির ও রং এর সেইসব মোমবাতি ।

অনেক রাতে আমরা গেলাম অ্যাসাইলামের দিকে । নি:শব্দ পথে রাতপাখির ডাক । আমরা কেবল দুটি প্রাণী । গা ছমছম করছিলো । পরে দেখি দূর থেকে সাদা সাদা কিছু ছায়ামূর্তি ভেসে আসছে ।

তবে প্রেত নয়, ওরা মানুষ বটে !

ওরাও এসেছে ঘোস্ট ট্যুরে ।

শেষকালে অফিস দেখা গেলো বিচওয়ার্থ অ্যাসাইলাম এর । যেখানে এখন ঘোস্ট ট্যুর হয় ।

অনেক ট্যুরের যাত্রী , নানানভাবে সেজে এসেছে। কেউ কেউ একটু ভয়ানক রূপে এসেছে ।

ঘোস্ট ট্যুরের গাইড এলেন । উনি ভূতের মতন সেজে এসেছেন । ওনার সঙ্গিনীও একইভাবে সজ্জিতা ।

দেখে ঘাবড়ে গেছি আমি !

এমন হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন এসেই ! বাপ্‌রে !

পুরো ইতিহাস বলে দিলেন আগেই ।কোথায় কি হবে ।

কোন কোন স্থানে গায়ে কাঁটা দিতে পারে ইত্যাদি ।

ওখানেই আলাপ হল দেগানির সাথে । মেয়েটি কালো । খুবই কালো । কিন্তু ইহুদি । ট্যারো রিডার । এখানে এসেছে ঘোস্ট হান্টিং করতে ।

আমরা বসে বসে কফিপান করছিলাম ।

একটু পরে ট্যুর হবে তাই সময় কাটাচ্ছিলাম ।

তখনই ওর সাথে কথা হল । ওর বাবা ইহুদি ছিলো । মা অ্যাফ্রিকান । তাই ও এতটাই কালো । আমার থেকেও বেশি কালো । **আমার থেকে কালো মানুষ আমি দেখিনি, মনে করতাম আমিই জগতের শেষ কালো । আগে দক্ষিণ ভারতে থাকতাম । কলকাতা থেকে যাবার সময় সবাই বলছিলো , ওরে তুই ওখানে যাস্নে ! তোকে ওরা বাসা থেকে তুলে নিয়ে চলে যাবে । বলবে, আইও! এতদিন কোতায় চিলে আস্মা ?**

তুমি তো আমাদের নোক্ গো ।

মেয়েটি খুব নরম সরম ।

ও জানালো যে ও লেসবিয়ান । ওর সাথী আসেনি । কিন্তু সে মেমসাহেব । নাম ডোরিয়া ।

বেশ কবিতা আছে দুজনের নামে তাইনা ? দেগানি আর ডোরিয়া ।

দেগানি বললো যে দেশের সব জায়গাতে লেসবিয়ান ও গে-দের জন্য কাফে খোলা উচিৎ । সেম সেক্স কাফের খুবই প্রয়োজন এখন সমাজে ।

সাধারণ কাফেতে ওরা প্রাণ খুলে আড্ডা দিতে পারেনা । লজ্জা পায় খুব । লোকে দেখে ড্যাব ড্যাব করে যখন ওরা চুম্বন করে । তাই ওরা প্রাইভেসি চায় ।

আরও বললো যে ইহুদিরা খুব একটা নিজের ধর্ম বা কমিউনিটির বাইরে বিয়েশাদি করেনা । ওর বাবা করেছিলো বলে একঘরে হয়ে যায় । তায় মা আবার কালো মেয়ে । ওরা আবার মুসলমানদের মতন খত্না করে । ওর বাবার সেক্স অর্গ্যান পার্ফেক্ট ছিলো না ।

তাই ভয়ে ও লেসবিয়ান হয়ে গেছে ।

এত স্বল্প পরিচয়ে নিজের মনের দরজা এইভাবে যে কেউ খুলে দিতে পারে তা ওকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না ।

প্রশ্নও করলাম , আমাকে তো তুমি চেনোও না !

ও হেসে উঠলো । হাসলে ওকে খুব সুন্দর দেখায় । বলে ওঠে , জানো তুমি তো লেখো । মানুষের মাঝে এই চেতনা বাড়াও যে এইসব উল্টোপাল্টা জিনিস করলে ধর্মের নামে-- কত লোকের জীবন বদলে যেতে

পারে । মুসলিমরাও তো এটা করে । সেক্স কমানোর জন্য । কিন্তু ওদের সন্তান সংখ্যা দেখো ! আর ধর্ম গুরুরা আমাদের সব সময় গালি দেয় আমরা বিকৃত বলে ।

আমি আর তর্কে গেলাম না । কারণ আমি এই বিষয়ে কিছুই জানিনা । তবে কিছু বছর আগে এখানে এক প্রখ্যাত খেলোয়াড় টুইট করেছিলেন এই বলে যে , গেও লেসবিয়ান মানুষের জন্য গডের প্ল্যান হল হেল্ ।

তাই নিয়ে দেশে সাড়া পড়ে যায় । খুব হৈচৈ হয় ।

হয়ত তাই এগুলি বললো মেয়েটি । আমি ঠিক বুঝলাম না । তাই কথা বাড়াই নি ।

উঠে চলে যাই ওর কাছ থেকে । মনে মনে ভাবলাম যে অমৃতের সন্ধানে যাবার জন্য মহামানবেরা পথ দেখিয়ে যান সেই পথই বিষবৃক্ষ হয়ে দেখা দেয় কারো কারো জীবনে । হয়ত এরই নাম জীবন বা ম্যাট্রিক্স !

যার থেকে বার হবার উপায় কারো জানা নেই ।

কালচক্রে পড়ে কেবল ঘুরতেই থাকো আর ঘুরতেই থাকো । ভালো লাগুক আর নাই লাগুক ।

মেয়েটি ট্যারো রিডিং ব্যাতীত আরেকটা কাজও করে । সেটা হল শেফের কাজ । বলে , আমরা যেখানকার

মানে আমার মা , সেখানে সবসময় রঙীন জিনিস রান্না করে খাওয়া নিয়ম । আর টাটকা । যেমন লাল কুমড়ো তে পিঁয়াজ শাক কুচি আর সাদা রসুন ভাজা ও হলুদ ক্যাপসিকাম । অথবা টমেটোর সাথে বেগুনি ক্যাবেজ আর সবুজ বিন্স ও লাল ক্যাপসিকাম্ ও হলুদ ছোলা এইসব খাবার আমরা খাই । এতে নাকি পুষ্টি হয় ।

কার্বস কম খাই । প্রোটিন বেশি খাই ।

আমাকে বললো, খেয়ে নেবে । এইভাবে খেয়ে নেবে ।

পাউরুটির ভেতরে এইসব দিয়ে ওপরে ডিমের পোচ দিয়ে খেয়ে নেবে । সবসময় দেখবে খাবার যেন মাল্টি কালার হয় ।

ওর ভাই নাকি পড়াশোনা করতে চাইতো না। কোনো কাজও করতো না । কিন্তু রান্না করতে খুব ভালোবাসতো । তা ওর মা বলতো , বাছা আমাদের ঘাড়ে বসে আর কতদিন ? কিছু তো করে খেতে হবে !

কাজকম্মো তো করে খেতে হবে । বাবা , মা আর কতদিন? বিয়ে যদি নাও বা করো বাবা ও মা আর কদিন আছে ? সারাটা জীবন কে তোমাকে বসিয়ে খাওয়াবে ?

সেই ভাই নাকি ক্যাটারিং নিয়ে পড়বে শেষে ঠিক করলো কিন্তু তাদের তত অর্থ নেই । ওদের বাবা তেমন বিশেষ কোনো কাজ করতো না । মোটামুটি চলে যেতো । মা মনে হয় ট্যারো রিডারই ছিলো । বেশি কিছু ইনকাম ছিলো না তারও । শেষে ফন্দি করে ওরা করলো কি আশেপাশের বাসায় ওকে কাজে লাগিয়ে দিলো । বিদেশে তো কোনো কাজ নিচু চোখে কেউ দেখেনা । প্রথমে ফ্রিতে তারপরে ও সাপোর্ট সিস্টেমে কাজ নিলো । ওখান থেকে লোকের বাড়ি রান্না করতো । এইভাবে মোট বারো বছর করলো । ভালো রন্ধনের হাত । খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতো সব । এখন ভালো একটা হোটেলে কাজ পেয়েছে । তবে একটু রিমোট এলাকায় । ওর মাকে ও একটা রূপার চায়ের সেট কিনে দিয়েছে । ওর ভাইয়ের স্বপ্ন একদিন ক্যাটারিং এর ব্যবসা খোলার । হয়ত হয়েও যাবে ।

যদি ওপরওয়ালা চান । যাঁর ইচ্ছেয় , আমার নাম অ্যান্টনি , কাজের কিছুই শিখিনি -----গুড ফর নাথিং ----আজ এই জায়গায় এসেছে ।

এই ভৌতিক জায়গায় ঘুরতে আমার বেশ ভয় লাগছিলো । একটা ঘরে এতই তান্ডব হয় যে কেবল সাহসীদের ডাকা হয়েছিলো । আমি সেখানে গেলেও ভালই গায়ে কাঁটা দেয় আমার । একটা মর্গে নিয়ে

গেলো । সেটাও ভয়াবহ । আমি দলের প্রথম দিকে ছিলাম । ভূত শিকারীরা দেহহীন স্পিরিটদের সাথে কথা বলছিলো । ওদের নানান রকম শব্দ করতে আহবান করা হচ্ছিলো এবং ওরাও সেটা সুষ্ঠুভাবে পালন করছিলো । কিছু ছায়া দেখা গেলো । নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে । মোট কথা অতীন্দ্রিয় পরিবেশ ও বেশ গা ছমছমে । এখানে কৌতুহলীরা আসতেই পারেন ।

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

এরপর আমরা গিয়েছিলাম ইস্কন মন্দিরে । এটা কুইন্সল্যান্ডের কাছে নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌ রাজ্যে ।

এদিকে সবুজাভা খুব বেশি । সিডনি থেকে যেতে হয়েছিলো । পাহাড়ের ঢাল বেয়ে , বনবনান্ত পার করে একটি পাহাড়িয়া স্থানে এই মন্দির । সাদা মানুষেরা চালান । আমরা ওদের নির্ধারিত বুনো কটেজে ছিলাম । মন্দির প্রাঙ্গনে নানাবিধ ফুলের মেলা । **মনে হয় যেন শ্যামসুন্দর সমস্ত গোপিনী ও রাইদের সাথে এখানে হোলি খেলছেন । এত্তো সুন্দর সুন্দর পুষ্পাঞ্জলি গাছের স্তরে স্তরে ।**

মোহনবাঁশির সুরও বুঝি কান পাতলেই শোনা যায় !

একতলা মন্দির সুগ্রন্থিত । আছেন শ্রীহরি , রাধিকা , নৃসিংহ দেব এবং আরো অনেক দেবতারা ।

পাশেই ডাইনিং হল । তিনদিক খোলা । বাফে হিসেবে খাবার দেওয়া হয় । বিদেশী ও ভারতীয় দুই আছে ।

ভারতীয় খাবারকে অনেক পরিবেশন কর্মী আনহেলদি ফুড বলে উল্লেখ করছিলো ।

ইচ্ছে মতন নেওয়া যায় তবে পশ্চিমের খানাই বেশি ।

বহু গেরুয়াধারী বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী চোখে পড়লো । রসকলি কাটা কপালে । মুক্ত প্রেমে ও কৃষ্ণ ভজনায় বন্দী সকলে । তুলসী কাঠের মালা গলায় পরা ও হরিনাম জপ করছেন । সন্ধ্যায় হরি নাম সংকীর্তন হল । খোল বাজিয়ে সে এক উদ্দাম নৃত্য !

মাথায় নানান রং এর টুপি ও ওড়না জড়ানো ছেলেপুলেরা নাচে ও গানে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ।

একটি ছোট্ট দোকানও আছে । ইস্কনের বিভিন্ন জিনিস মেলে সেখানে ।

আমাদের কটেজে কিন্তু কোনো প্যান্ট্রি ছিলো না ।

কেবল চা ও কফিপানের ব্যবস্থা ছিলো ।

যখন আমরা যাই তখন থেকে আকাশের মুখ খুবই ভার ছিলো । ক্যানবেরা থেকে বহুদূর তাই মাঝে একটি সমুদ্রতীরে ছিলাম । হোটেলটি বিরাট । আমার ঘর ছিলো সাগরের কিনারায় । বেডরুম ও ড্রয়িং রুমে বসে দুচোখ ভরে শুধু সমুদ্র দেখো ।

সময় কেটেই যায় । মাঝে মাঝে নৌকোর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ । কেউবা নিজের প্রাইভেট বোট নিয়ে সাগরে নামছে । এখানেই একজনের সাথে আলাপ হল । নাম বিবর গুপ্ত । ভদ্রলোক অস্ট্রেলিয়াতে পুরোহিতের কাজ করেন । কোনো মন্দির ভারত থেকে ওঁকে নিয়ে এসেছিলো । উনি একটি অদ্ভুত গল্প বলেন ।

ওঁদের পৈত্রিক বাসা ছিলো গ্রামে । সেখানে প্রায়ই ডাকাতি হতো । একবার পুলিশ ডাকাত ধরতে এলে সবাইকে ধরলেও দলের পান্ডাকে পায়না । সর্বত্র খুঁজে দেখা হয় । কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া যায়না ।

এদিকে পুলিশে ছেয়ে গেছে বাসা । পালাবার পথও নেই । শেষকালে পুলিশ চলে যেতে দেখা যায় যে সে মন্দিরে মাকালীর মূর্তির পাশে অসুরের মতন বসে ছিলো মায়ের লাল কাপড় মাথায় বেঁধে ।

পুলিশ সরে যেতেই বেরিয়ে নাকি এক গ্লাস জল খেতে চায় । বাড়ির গিন্নী ওকে জীবন্ত দেখে ভয় পেয়ে গেলে তাকে কসিয়ে একটা চড় মারে । সেই দাগ নাকি এখনও গিন্নীর গালে আছে ।

বিবর বাবু নিজের গলা দিয়ে দুই তিন রকম আওয়াজ বার করতে পারেন । লতা, কিশোর, আশা অথবা উষা উত্থুপের মতন গান করতে পারেন নিজেরই গলা দিয়ে । গেয়েও শোনান কিছু কিছু । চমৎকার গলা । গভীর ওঁর স্বর , সেই স্বর থেকেই ভেসে আসছে লতা/ আশা । আমরা খুবই ইম্প্রেস্‌ড ওঁর গান শুনে । ডাবিং আর্টিস্টদের মতন ।

এখানে নাকি প্রোগ্রামও করে থাকেন ।

ফেরার সময় খুব বৃষ্টি শুরু হয় । পরে সিডনি ইত্যাদিতে জল জমে একাকার । আমরা যখন বাড়ি প্রবেশ করি তারই মাত্র কয়েক ঘন্টা পরে সিডনিতে বন্যা ঘোষিত হয় । অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা । যাবার সময় ওসব দিকে প্রচন্ড বর্ষণ হচ্ছিলো । অনেক

জায়গাতে জল জমা ছিলো । বহু ছোট ছোট শহরে ও তার বাইরে দেখি লোকে ব্যবহার্য দ্রব্য ফেলে দিয়েছে জলে নষ্ট হয়ে গেছে বলে । ভালো ভালো ফার্নিচার, টিভি, মাইক্রো ওয়েভ , ফ্রিজ, সোফাসেট ।

দেখেই বোঝা যায় অনেক দামী সেসব বস্তু । কিন্তু জলে নষ্ট হয় গেছে । সবারই প্রায় বাসার সামনে ফেলে দেওয়া সংসার । জামাকাপড় ও বইখাতাও আছে ।

এই যাত্রা শেষে যাই এক বন্ধুর বাসায় । সেদিন আমরা পিকনিক করি । আমি অনেক কিছুই রান্না করি ।

বাটার চিকেন, সবজি দিয়ে প্রণ ফ্রাই আর বিফের একটি ভিয়েৎনামী ডিশ । বন্ধুরাও রান্না করে । পরে জমিয়ে গল্প শুরু হয় । স্বর্ণালী সন্ধ্যায় চা পানের সাথে সাথে দেখা যায় কিছু হরিণ ঘুরছে দূরে । এরা ফসল খেতে হানা দেয় । অনেকে গুলি করে মেরে তারপর রোস্ট করে খায় । আমার বন্ধুর বাসায়ও একটি হরিণের মমি আছে । সেটা অবশ্য টাসমানিয়া থেকে মেরে এনেছে কেউ ও তাকে মমি করা হয়েছে ।

দেখে মনে হয় জীবন্ত একটি মৃগ শরীর । কালো নয়ন মেলে চেয়ে আছে ।

বন্ধুর শাশুরি মা তার সারাটা জীবন কাটান মরু শহরে। কারণ উনি সবুজ রং ঘৃণা করেন। তাই গাছপালা বিহীন এলাকায় জীবন কাটান। বাসায় বাগান করতেন কিন্তু সমস্ত লাল, হলুদ গাছ লাগাতেন যাদের পাতাও সবুজ নয়। বলতেন- আই হেট গ্রিন। প্রচন্ড জলকষ্ট সহ্য করেও মরুভূমে দিন কাটান।

অবাক লাগলো শুনে। আমাদের প্রায় সবারই সবুজ দেখলে চোখের আরাম হয়। এটাই স্বাভাবিক। কেরালা, আসাম, বাংলার সবুজাভা মন মাতায়।

এতদিন ভাবতাম সবারই এমন মনে হয়। এখন জানলাম ভিন্নস্বাদের মানুষও হয়। **কথায় কথায় বার হল এদেরই আবার পরিচিত কেউ মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলো কর্মসুত্রে। কিছুদিন পরেই পালিয়ে আসে। কারণ ওখানে নাকি সবুজ নেই। গাছপালা খুবই কম।**

এখানে আরো একটি মানুষের কথা জানলাম। উনি নাকি পায়ে পায়ে পুরো দেশ চষে বেড়ান। কোথায় রাতে ঘুমান কেউ জানেনা। সারাটাদিন পথে ঘোরেন। লোকের দান করা খাবার খান। তবে ভিখারি নন।

ভবঘুরে। বয়স নাকি ৯০ এর ওপর। ত্রিশ থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাঁধে ঝোলা। পরণে প্যান্ট ও জোব্বা।

কেউ ওকে খাবার কিংবা ডলার দিলে উনি স্বরচিত গান কিংবা কবিতা উপহার দেন । কারণ উনি ভিখারী নন ।

নিজেকে ভবঘুরে বলতেই ভালোবাসেন । এতেই খুশি । জীবন একটি বৃত্ত । তাকে যে যেইভাবে পারে পূর্ণ করে কিন্তু এই নীল ঘূর্ণীর থেকে বার হবার পথ বুঝি কারো জানা নেই ।

মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ তাই আমার মনে হয় একমাত্র রং দিয়েই সবাইকে একত্রে বাঁধা যাবে ।

বলেছিলো মৌলি পাল । আলাপ সেই পথেই । একসাথে আমরা একটি বিরাট স্টিমারে করে সিডনি হারবার ব্রিজ দেখতে যাই । সেখানেই কথা হয় ।

ভেসেলের খোলা ছাদে বসে ।

-দেখো, রং কার না ভালোলাগে ? আমরা সব্বাই যদি রংকে আমাদের আইডেন্টিটি মানি তাহলে হয়ত সমাজে একতা ও সমতা আসবে , কী বলো ?

শুধায় মৌলি । পাল তোলা স্টিমারে বসে ।

ময়ূরপঙ্খী নাওয়ে ভেসে ।

এই মিথকথনের কোনো উত্তর হয়না । হলেও আমার জানা নেই ।

বিশ্বাসীদের যুক্তি লাগেনা আর অবিশ্বাসীদের শত যুক্তি দিলেও তারা মানেনা এই কথা অনেকবার শুনেছি।

এইদেশেই এক ব্যাক্তিকে দেখি যার দেহে লর্ড যীশু ভড় করেন । নাম জন মেলার । উনি পাদ্রী । এর স্পর্শে নাকি নানান দুরারোগ্য অসুখ সেরে যায় ।

আমাদের পরিচিত এক মানুষের কাছ থেকে জেনে ওঁর সান্নিধ্য পাই । আমাদের কুইন্সল্যান্ডে যেতে হয় । ক্ষুদ্র গীর্জা । পরিপাটি করে সাজানো । স্বল্প খাবারের ব্যবস্থা ও লোকে লোকারণ্য । **সবাই জনকে ছুঁতে চায় এমনই ক্যারিজ্‌মা ওঁর ।** সঙ্গে তাঁর পত্নীও আছেন ।

ভদ্রমহিলা একটু যেন গর্বিত স্বামীর জন্য । তবে কাউকে হাত মেলাতে ডাকছেন না কারণ ওঁর নাকি কোভিড হয়েছিলো । প্রথমে অনেক যীশুর ভজনা হল । স্টেজে উঠে, দলবেঁধে রঙীন সাজে সজ্জিত যুবক যুবতীরা উপাসনা সংগীত পরিবেশন করলো । সবাইকে জল ও ক্যান্ডি দেওয়া হল । এরপরে জন নিজেকে পরিচিত করেন সবার সাথে । কীভাবে উনি

এই আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ করেছেন এবং লজিক দিয়ে এর কোনো ব্যাখ্যা পাননি সেসব জানান । ওঁর স্ত্রী বলেন যে উনি নাস্তিকের বাসার মেয়ে । কিন্তু জনকে ভালোবেসে এগুলো জানতে পারেন ও বুঝতে শেখেন । আমাদের হিন্দুদের মতন ওরাও ধ্যান করে থাকেন । কথায় বলে কুলকুন্ডলিনী জাগ্রত হয়ে মূলাধার থেকে বার হলে লোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারে । তা নাহলে অবিশ্বাস থেকেই যায় । তবুও লোকের ঘটা দেখে মনে হয় বিশ্বাসের থেকেও ফলে লোকে বেশী আকৃষ্ট হয় । **ভগবৎ গীতার বাণী অচল । মা ফলেষু কদাচন !!**

ভদ্রলোক এক এক করে মানুষকে ডাকেন । নিজের থেকে রোগের সমন্ধে বলতে শুরু করেন । রুগী গেলে ওঁর স্পর্শে মানুষ সেরে ওঠে । কেউ সাথে সাথে কেউবা পরে । কারো কারো সারেও না কোনোদিন।

তবুও লোকে যায় বিশ্বাসে , সারবে আন্দাজ করে ।

আমার অবশ্যি মনে হয় যাদের কর্মে থাকে তাদেরই শুধু সারে । কর্মা না থাকলে সে সুস্থ হয়না ।

শন কোনারির(James Bond) শাশুড়ি মা নাম Phyllis Cilento নাকি যুক্ত জনের সাথে । উনি পেশায় চিকিৎসক । এসব শুনলাম । মনে হয় জনের

জন্মের সময় উনি তার ধাত্রী ও চিকিৎসক ছিলেন। ভদ্রমহিলা ধার্মিক ছিলেন । প্রচুর দান ধ্যান করতেন ও নিজ হাতে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুদের জন্য প্রার্থনা করতেন । খ্রীস্টানদের প্রেয়ারের একটা ব্যাপার আছে যেমন মুসলিমদের আছে দুয়া করা ।আমি নিজের অসুখ সারাতে যাই । মধুমেহ অনেক কমে গেছে । আজকাল আমি মিষ্টি খেলেও সুগার বাড়েনা তেমন । ইন্সুলিন কম নিতে হচ্ছে । আমরা কয়েকজনকে চিনি যাদের ক্যান্সার ইনি সারিয়ে দিয়েছেন । আমার প্রি-ক্যান্সারাস্ টিউমার আছে ৭খানা, যা খুবই রেয়ার বলে সঠিক চিকিৎসা জানেনা কেউ তেমন, সেটাও কমে যাবে বলে শুনলাম ।

বললেন, গড ইজ নট ইওর ডক্টর । তোমাকে সব রোগ উল্লেখ করতে হবেনা । যা কমার কমবে যা সারার সারবে । যা থাকার তা যাবেনা ।

আমার থেকে বেশি উপকার পেলেন আমার পতিদেব । মেরুদন্ডের কাছে হাড় বেড়ে যাওয়াতে অপারেশান করতে বলে ডাক্তার । এতই ব্যাথা যে স্টেরয়েড নিতে বলে চিকিৎসক । কিন্তু যীশু ঠাকুর স্পর্শ করাতে আমার বরের ব্যাথা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে । অনেকে এদের কাছে এসে ফেথ হিলারের স্পর্শ পেয়ে বিদ্যুতের ঝটকা লাগার মতন মাটিতে পড়ে যাচ্ছে ।

অজ্ঞান হবার মতন পড়ে আছে । তাদের তোলার জন্য একটি দল আছে । তারা বিশালাকৃতির । তারাই এসে তুলছে । কেউ বা উল্লসিত রোগ সাথে সাথে সেরে যাওয়াতে ।

এমন মানুষের মেলা আমি কখনো দেখিনি । ভারি মজা লাগলো । ভদ্রলোক অস্ট্রেলিয়ার আউটব্যাকের মানুষ । আমেরিকার টেক্সাসে যেমন র‍্যাঞ্চ ও কাউবয় সম্পর্কে জানা আছে সেরকম অস্ট্রেলিয়ার আউটব্যাক এই দেশের বিশেষত্ব ।

জন গৃহযুদ্ধের মধ্যে মানুষ । বাবা অ্যাবিউজ করতেন সংসারের সকলকে । বদরাগী মানুষ ।

তাই জন পরে নানান অ্যাডিক্শানের কবলে পড়েন,পাড় মাতাল ছিলেন । মাত্র ১৫ বছর বয়সে মদ্যপ হন । গার্লফ্রেন্ডকে হারিয়ে দুখী হন । এখানে বাইকি গ্যাং খুব পপুলার ।এরা বাইক নিয়ে লুটপাট করে, ড্রাগ ও অন্যান্য নেশার জিনিস নিয়ে কারবার করে । নটোরিয়াস্ । এই গ্যাং এ সামিল হবার জন্য তালিম নেন । পরে যীশুর পরশ পেয়ে আজ প্রখ্যাত ফেথ হিলার । সারা জগৎ চষে বেড়াচ্ছেন ।

বড় বড় কাগজে, টিভিতে ওঁকে ডেকে নিয়ে গেছে কথা বলানোর জন্য । খুবই মার্জিত মানুষ । আগেই বলে

দেন, **আমি কেউ না কিছু না সবই যিসাসের কৃপায় হয়** । ওঁনার স্ত্রী রূপবতী । গোলাপ রং এর মতন পোষাকে মোহময়ী । পুতুল পুতুল গড়ন । সদা হাস্যরসে সিক্ত । পতি গর্বে গরবিনী ।

বলে ওঠেন স্নিগ্ধ হেসে ,

আই অ্যাম জন মেলার্স ওয়াইফ কাজেই রোগ আমার হয়না ।

যদিও কোভিড সারেনি ।

হয়ত দেবতাদেরও কোভিড সারানোর টিকা এখনও বার করা হয়নি মনে মনে ভেবে হাসলাম ।

আর দেখোনা কোভিডে বা তার ভ্যাকসিন নিয়ে কত লোক মৃত কিন্তু বদলোক সহজে মরেনা । কোনো ডন্ বা ক্রিমিন্যাল কোভিডে মরেছে শুনেছো কেউ ?

এখানে সবাই বিরতিতে নানান ড্রিঙ্কস্ পান করছিলো । একজন জার্মান ব্যাক্তি হেসে জানতে চান , বলতো - এই তোমরা দেখোনা কত পানীয় পান করছো । কেউ কোক্ কেউবা লাইম কেউ নেহাৎ-ই কফি । এবার জবাব দাও যে আমাদের জার্মানদের প্রিয় পানীয় কী ?

কেউ বলতে পারেনা । একজন মিহিস্বরে বলে ওঠে, **ইস ইট বিয়ার ?**

ভদ্রলোক খুব জোরে জোরে হাসেন । হেসে বলে ওঠেন, ভেরি সিম্পেল । জিউশ্ ব্লাড !

-হা হা হা হা সকলে হেসে ওঠে ।

তাদের মধ্যে কিছু ইহুদিও ছিলো ।

আসলে টাইম ইজ দা বেস্ট হিলার ।

নাহলে ইহুদিগণ এইভাবে হাসতে পারতো ? হিটলারের জন্য তো আমাদের পবিত্র স্বস্তিকা চিহ্ন বিদেশে অস্বস্তিতে ফেলে ।

* * *

আলাপ হয়েছিলো বনজ মেয়ে কাইলির সাথে । বাবা তার অ্যাব অরিজিন্যাল । মা মেমসাহেব ।

মা নৃতত্ত্ববিদ্ । সেখান থেকে প্রেম । বাবা পাড় মাতাল ছিলো । ওর মাই তা ভালো করে ।

কাউন্সিলিং করে করে । বলে -সভ্য সমাজে লোকে কী যে ভাবে এদেরকে ।আমরা প্রাত:রাশ সারি এগ, বেকন এসব দিয়ে । আর এদের কথা উঠলেই বলে , এরা কি গন্ডারের চামড়া ভাজা খায় চায়ের সাথে ?

বাসায় কেউ এলে মাথায় কেরোসিন ঢেলে স্নান করাতে হতো । পোকার ভয়ে । একবার এক আত্মীয়

সারা গায়ে ডিস্‌ইনফেক্ট স্প্রে করে দেয় । ভাবে এইভাবেই এদেরকে শুদ্ধ করতে হয় । ছেলে মানুষ । কিছু ভেবে করেনি । শুধু অ্যাব অরিজিন্যাল শব্দটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলো ।

পরে অবশ্যি কাইলির মা ও বাবার বিচ্ছেদ হয়ে যায় । মারপিট কারণ । অপছন্দের ট্যাটু নিয়ে ঝগড়া হলে এমন মার দেয় ওর বাবা যে মাকে হাসপাতালে যেতে হয় । ট্যাটু তুলতে অনেক খরচ লাগে । তাই ওর মা সেগুলি মেটাতে পারেনি ।

এখন নিজে দোকান খুলে ফ্রিতে ট্যাটু তোলে । এটা ওর পেশা নয় । পেশা নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়ানো । এটা ওর প্যাশন । সমাজকে কিছু দিচ্ছে আরকি ।

সমাজ চলে গিভ অ্যান্ড টেক্‌ এর ওপরে । ওর বাবার সাথে ছাড়াছাড়ি হবার পরে সমাজ ওকে হেল্প করে । নানান এনজিও ওকে সহায়তা করে মনকে শান্ত করার জন্য । তাই এখন ওর মা এটা করে কিছু ফেরৎ দিচ্ছে ।

বলে, বনের ধারে বাসা ছিলো । ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনে মনে হত অরণ্যে ঘুঙুর বাজছে । বড় মন ভালো হয়ে যেতো । শহুরে কোলাহল থেকে দূরে এসে ।

সারাটা জীবন এখানেই কাটাতে চাই হোয়ামের সাথে । হোয়াম ওর বাবার নাম । কিন্তু নির্জনতাই কাল হল শেষে । মারধোর খেয়ে পালানোর কোনো স্থান ছিলো না । চারিদিকে গহীন বন আর ক্রমাগত ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক- মনে হয় যেন কেউ ঘন্টা বাজিয়ে সাবধান করছে **--এখানে মধুর আবেশ দেখে ভুলিস্ না । ঢং ঢং ঢং ঢং এখানে নীরবতার সাথে সাথে আছে ভয়াল একাকীত্ব । শিকারীর নখ দাঁত থেকে কেউ বাঁচাবে না ।তাই পালা সবাই পালা ----!!**

ওর মা নাকি যতদিন বাবার সাথে ছিলো ততদিন ক্যাঙারুর মাংস খেতো বড় বড় টমেটো ও পেঁয়াজ কলি দিয়ে । এই পশুর ল্যাজও খেতো । শামুক খেতো । বন্য নদীর ছোট ছোট মাছ ধরে পুড়িয়ে খেতো । খুবই মজাদার ব্যাপার ।

মাটির ওপরে গর্ত্ত করে তার ভেতর মুরগির ডিম দিয়ে তার তলায় সুড়ঙ্গ কেটে আগুন জ্বালিয়ে সেই ডিম পুড়িয়ে আজব ভাবে খেতো । কারণ ব্যাপারটা অ্যাডভেঞ্চারের মতন ।

ওর মায়ের কাছেই জানলাম, এক আদিবাসী মহিলার আঁকা চিত্র এখানে বিখ্যাত একটি বিমান সংস্থা কিনেছে মিলিয়ন ডলারে । এখন সেই ছবি বিমানের গায়ে চিত্রিত আছে । ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বিশ্ব ।

বনজ মহিলাটি মানে শিল্পী, মিলিওনেয়ার হলেও এসব কিছু বোঝে না । সে সেলিব্রিটি এখন তবুও খুবই নির্মল ও কোমল ।

@@@@@@@

সিডনির অনতিদূরে আছে ব্লু মাউন্টেন । নীল পাহাড় ।
আক্ষরিক অর্থেই এর রং নীল । বৈজ্ঞানিক নানান কারণ আছে এই নীলাভ পাহাড়ের সারির পেছনে ।

ইউক্যালিপ্টাস্ গাছি নাকি বেশি । আছে বেশ কিছু ছোট জনপদ বা শহর এই পাহাড়ের ওপরে ।

এটা সিডনির মানুষের উইকএন্ড কাটাবার স্থান । অনেকটা মুম্বাইবাসীদের মহাবালেশ্বরের মতন ।

এখানে আমার ঘোরা জায়গার নাম কাটুম্বা । সেখানে আগে আদিবাসীরা থাকতো । কিন্তু আমার আলাপ হয় এক রেড ইন্ডিয়ানের সাথে । আমেরিকা থেকে নাকি পালিয়ে এসেছে । সবাই আমেরিকা যেতে উৎসুক আর এই লোকটি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে । এখন এই নীল পাহাড়ে বসবাস করে । নিজের দুই ছেলে ।

বিয়ে করেছে এক ইজিপশিয়ান নারীকে । সেই রমণীর চোখের মণি হাল্কা নীল আর ধূসরের মাঝামাঝি ।

আমেরিকার বন্দুকবাজদের কথা হচ্ছিলো ।

লোকটি বলে ওঠে , ওখানে পাগলের হাতেও বন্দুক দেয় । কাজেই এরকম চলবেই । আমাকেই অনেক হ্যারাস করেছে আমি রেড ইন্ডিয়ান বলে । রেসিজম্, বোর্ডিং স্কুলে পড়ানো , দূরছাই করা এসব দেখে আমি কেটে পড়েছি । আচ্ছা বলো, আমার জন্ম কি আমার হাতে ? আর ওটা তো আমাদের দেশ ছিলো !বিশ্বব্যাপী মানুষ ওখানে ছুটে চলেছে সুখপাখীর আশায় অথচ আমাদের নেটিভদের কোনো আশা নেই ।

এখানেও প্রবলেম আছে তবে ওখানে জগাখিচুড়ি অবস্থা । আমেরিকানদের কোনো বিশেষ সংস্কৃতি নেই কারণ ওখানে দুনিয়ার সমস্ত অহং সর্বস্ব ব্যাক্তি গিয়ে উঠেছে । আমি কমিউনিস্ট নই বাট আই হেট ইউ-এস-এ ।

আমি হেসে বলে উঠি , সমস্যা সব জায়গাতেই থাকবে । প্রবলেম ওপটিমাইজেশানের নামই সভ্যতা ।

লোকটি বড় বড় কান চুলকে বলে ওঠে , তা যা বলেছো । তবে আমার মনে হয় আমাদের সভ্যতাই ওদের আদি সভ্যতা । যতই আমাদের ওপর এফ শব্দ বর্ষণ করুক না কেন !

লাল মানুষটি এখন নীল পাহাড়ের গায়ে জুতোর ব্যবসাদার। ঘন, সবুজ পাহাড়ি গাছের নীচে ওর

দোকান। চা বানাবার মেশিন আছে দোকানে। বেশির ভাগ জায়গায় দেখি কফি মেশিন রাখা। এর ক্ষেত্রে চায়ের সুব্যবস্থা দেখে প্রশ্ন করার আগেই বলে ওঠে, আমি চা প্রেমী। কফি তেমন ভালোলাগেনা।

মেশিনে বোতাম টিপে আদা চা, এলাচি দেওয়া চা থেকে শুরু করে ভারতীয় মসালা চাও মেলে।

সিডনিতে বহু ভারতীয়ের বাস। হয়ত তাই।

পশ্চিম সিডনিতে একটি দোকান আছে। চিপ্ স্টোর কিন্তু অসাধারণ শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ ভারতীয় খাবার মেলে। আমি ক্যানবেরা থেকে ওখানে যাই মাঝে মাঝে খেতে। এটি ওয়েন্টওয়ার্থভিল রেলওয়ে স্টেশানের কাছে। লোকে লোকারণ্য এই দোকান। এতই খাসা খানা মেলে।

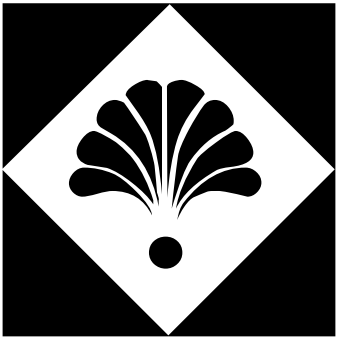

আরেক মানুষ হ্যারির দুই বৌ । প্রথমজন বিয়ের রাতে আসরে বসে ছিলো । হঠাৎ দেখে পা বেয়ে তাজা রক্ত ! ভাবে হয়ত পিরিয়ড হয়েছে অসময়ে । কিন্তু পরে দেখা যায় যে জোঁকে ধরেছিলো । একটি বনজ গীর্জায় বিয়ে হয় । সেখানে নদীর পাড়ে হয়ত বা গাছ থেকে জোঁক উঠেছিলো পোশাকে । মহিলা মানে বিয়ের কোনে এতে এতই লজ্জিত হয় সবার সামনে যে পরে আত্মহত্যা করে বসে ।

পরবাসে দেখেছি যে এদের সহ্য শক্তি খুব কম । অল্পেই এরা মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়ে ।

যাইহোক্ এই ঘটনার পরে মানুষটি আবার বিয়ে করে । এবারের স্ত্রী চৈনিক । চায়ের কাপের মতন গোল মুখ । তাতে ব্লাশার লাগানোর মতন লাল লাল গাল বসানো । ক্ষুদে চোখে সরল চাউনি ।

পাহাড়ে কেউ ট্রেকিং করতে এলে ওদের দোকানে খাবার রান্না করতে দিয়ে যায় । যেমন চাউমিন, মোমো, মাংস ভাজা এইসব । তবে ওখানে একটি

ভারতীয় দোকানে আমি পাঁঠার বিরিয়ানি খাই । এখানে গোট বলে ভ্যাড়া জাতীয় কিছু দিয়ে দেয় । আমাদের বাংলার পাঁঠা কিংবা খাসির মাংস নয় সেগুলো ।

তবে আমার পাশের পাড়ায় একটি দোকান আছে । সেখানে চমৎকার পাঁঠার মাংস মেলে ।

এত সুস্বাদু গোটের মাংস আমি আর কোথাও খাইনি ।

এতে কোনোপ্রকার বাজে গন্ধও নেই ।

দোকানি আদতে শিলং এর মানুষ । দেশে যায় বছরে একবার করে । ওখানে নাকি ওর হোম স্টের ব্যবসা আছে । আর ট্র্যাভেল এজেন্সি । ছোট থেকেই বিশ্ব ভ্রমণের ইচ্ছে ছিলো । মনে মনে ভাবতো , আর যাইহোক্ না কেন এক দেশে কখনো থিতু হবোনা ।

যেমন ভাবা তেমন কাজ । ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে ট্র্যাভেল এজেন্সি শুরু করে । অবসরে লোকাল গীর্জায় পাদ্রীর কাজ করতো । সেই সুত্রে কোনো ধর্মীয় কাজে যেতে হয় ইউ-কে । সেখানে কিছু বছর কাজ করে এই অস্ট্রেলিয়াতে চলে আসে । এখনও ভারতে সেই ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে । এবং জবরদস্ত ভাবে চলছে ।

বলে, দেশ বিদেশ ঘুরলে মন উদার হয় । একটা আলাদা এক্সপোজার হয় । বিদেশে না এলে জানতেই

পারতাম না কত বিচিত্র ধরণের মানুষ ও তাদের কালচার হয় । আমি এখানে এসে শিখেছি যে উই শুড্ এগ্রি টু ডিস্ এগ্রি ।মানবতা ও হিউমান রাইট্স যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাও জেনেছি ।

নীল পাহাড় অর্থাৎ ব্লু মাউন্টেন এলাকার মোহময় রূপ দেখার জন্য কতনা মানুষ এখানে ছুটে আসে ।

ঝরঝর ঝরে ঝর্ণা । তার খিলখিল হাসির শব্দে মুখরিত নীল পাহাড়ের শ্যামল বনভূমি ।

এখানে অনেক আর্ট ও অন্যান্য গ্যালারি আছে । আছে বিভিন্ন লুক আউট আর ভিউ পয়েন্ট ।

এখানে **থ্রি সিস্টার্স** বলে একটি ইকো পয়েন্ট আছে । সেখানে তিনটি পাথরের গঠণ আছে যা প্রাকৃতিক ।

আদিবাসীদের অঞ্চল ছিলো এই নীল পাহাড় । তাই কথিত আছে যে তিন বনজ কন্যাকে কোনো জাদুবলে এই পাথরে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে ।

এই তিন বোনের নাম মিহনি , উইমলাহ্ আর গুনেনডু । এই তিনজন তিন ভাইয়ের প্রেমে পড়ে যারা অন্য

বনজ সম্প্রদায়ের । বিবাহ অসম্ভব কারণ ট্রাইবাল আইন । তাই তিন ভাই ঐ মেয়েদের নিজ নিজ পত্নী করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে । অনেকটা আমাদের রাজারা যেমন আগেকার দিনে রাজকন্যেদের হরণ করতো সেরকম আরকি । এতেই যুদ্ধ শুরু হয় এবং ঐ তিন কন্যাদের জাদুবলে এক গুণীন পাথরে পরিণত করেন । তাতে হয়ত মেয়েদের প্রাণ বেঁচে যেতো । কিন্তু যুদ্ধে ঐ গুণীন নিহত হওয়াতে মেয়েরা পাথর হয়েই থেকে যায় । নাহলে আবার তাদের জাদুবলে মানুষের রূপান্তরিত করার কথা ছিলো ।

আরো দু একটি গল্প শোনা গেলো । তবে উপরিউক্ত কাহিনীটি সবচেয়ে লোকপ্রিয় ।

এই স্থান নাকি বহু প্রাচীন । কে যেন বলে ওঠে, তখন ডাইনোসরেরা ছিলো ডাইনিদের সাথে ।

অজস্র ঝোরা, ছোট নদী, ট্রেকিং রুট , অদ্ভুত খাদ , শিলার অপরূপ গঠণ , বুনো জন্তুর ডাক ও অসমাপ্ত সব পাথরের স্থাপত্য যার ভাস্কর কেবলই প্রকৃতি -কে পাশ কাটিয়ে যখন আমার রিসর্টের পর্ণকুটিরে পৌঁছাই তখন রাত গভীর হয়েছে । মাথার ওপরে বাঁকা চাঁদ ।

নিজের ঘরে এসে গরম জলে স্নান করে কফির কাপ নিয়ে বসি । নীল পাহাড়ের নীলাভ আবেশ ততক্ষণে আমায় নিয়ে উড়ে চলেছে ঘুম পরীর দেশে ।

রিসর্টের এক কর্মী জানায় যে কয়েক বছর আগের বিধ্বংসী দাবানলে তার সব ঘর বাড়ি পুড়ে যায় । কিছুই বাঁচাতে পারেনি । ইন্সুরেন্স করা ছিলো না তাই সর্বসান্ত হতে হয়েছে । এখন এই রিসর্টে কাজ করে ।

নিডিল ওয়ার্ক ভালোবাসতো । তাই পতি ও পত্নী মিলে আজব কাজ নিলো । ছাতা নিয়ে তাই উল্টে ঘর সাজাবার জিনিস তৈরি করে বেচতে লাগে । ছাতার গায়ে অপরূপ কাজ করা । সব হাতে । এই অভিনব ডেকোরেশান পিস্ লোকে কিনতে শুরু করে । সেই থেকেই রিসর্ট সাজাতে আসা ও কর্মী হিসেবে কাজ নেওয়া । এখন এখানেই আমাদের বাসা ।

কর্মীটি বাংলাদেশী । হেড়ে গলায় গেয়ে ওঠে ,

এই যে হেথায় কুঞ্জ ছায়ায়---

এই জীবনে যে কটা দিন পাবো

তোমায় আমায় হেসে খেলে কাটিয়ে যাবো দোঁহে

স্বপ্ন মধুর মোহে ।

দেশ থেকে এতদূরে এসে আমরা আর পড়শী নই । সবাই বাঙালী । আমরা কেবল ভাষাটা নয় শেয়ার করি রবীন্দ্রনাথ , বাংলা গান , **সুচিত্রা সেন মানে আমাগো ছুচিত্রা (ওরা বলে থাকেন)** ও সত্যজিতের সিনেমা সবই ।

কাকজোছনায় রিসর্টের বন্য সবুজে হাঁটতে হাঁটতে আমার এরকমই মনে হল । একাকীত্ব বুঝি মানুষে মানুষে নৈকট্য বাড়ায় । তখন ভারত আর বাংলাদেশের সীমারেখাটা খুব সহজেই বুঝি মলিন হয়ে যায় । হৃদয় মাঝে , মনের কোণে ।

আজকাল কবিতা বড় একটা কেউ পড়েনা বলে শুনি ।

কিন্তু এতদূরে এসে এবং একা একা থেকে থেকে

আমরা পরস্পর হয়ে উঠি জীবন্ত উচ্চাঙ্গের কবিতা ।

পেরিয়ে চলি একের পর এক উৎসব । ঈদ, দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং দোল পূর্ণিমা । আমরা কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধই থাকি । সাঁঝে ও অমল প্রত্যুষায় । কালপুরুষের নীচে, মায়াবী গ্রহপুঞ্জের দিকে চেয়ে ।

+++++

সবশেষে বলি এক অন্য মানুষের কথা । আমি ঐ মধ্যভারতের চম্বলের দিকে গিয়েছিলাম, সেখানকার মানুষ । বিদেশে পড়তে এসেছিলো । আমি লিখি শুনে নাম দিতে না করলো । সে বললো , বাগী ও ডাকাত এক জিনিস নয় । বাগী মানে শোষণের বিরুদ্ধে যারা লড়ে । আর ডাকাত হল দস্যু । লুটপাট করে । বাগী ইজ নট আ গ্যাঙ-স্টার অর মাফিয়া ।

কিছু বাগীর নাম শুনলাম । পান সিং টোমার, ডাকু মোহর সিং , ফুলন দেবী , মান সিং, নির্ভয় সিং গুজ্জার । **সোজা বাংলায় এরা রেবেল ।**

আমি ওখানে গিয়েছিলাম যখন গোয়ালিওরে যাই ।

আমার এক আত্মীয় ওখানে থিতু । অবশ্যই ডাকু নন।

তার সাথে এক মন্দিরে যাই । সেখানে ২৪/৭ খাবার মেলে । ফ্রিতে । প্রসাদ কিন্তু পেট ভরা খানা । ওরা পশুপাখিকেও খাবার দেয় লজিক হল দেবতা এইরূপেই আসতে পারেন পরীক্ষা নিতে । পাহাড়ের ওপরে ছোট্ট

মন্দির । যে কেউ গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন । মাতা ভাবেশ্বরীর মন্দির ।

জায়গাটির নাম ছিলো বোধহয় মোরেনা । চম্বল নদীর কাছে যতদূর মনে পড়ছে । চম্বলের জল নাকি ঘীয়ের কাজ করে এতই স্বাস্থ্যকর ।তবে উগ্র এইসব মানুষ ।

এখানে কোনো নদীতে পরশুরাম শত্রু বধ করে তাঁর কুঠার ধুয়েছিলেন তাই লোকে উগ্র বা রাফ ।

এখানে আমেরিকার মতন সবাই বন্দুক রাখে । মোট ৬৩০০০ লাইসেন্সড্ বন্দুক আছে এলাকায় । বাসা বানানোর চেয়ে বন্দুক কেনাই লোকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে । একটি বন্দুকের দাম ১ লক্ষ টাকা ।

বন্দুক কয়েকটি প্রজন্মের হাতে থাকে বলে ওরা দাম দিয়েও এগুলি কেনে ।

বাইরের লোকের কাছে অবাক লাগলেও ওরা শিশুকাল থেকে এতে অভ্যস্থ । বাসায় লোডেড্ বন্দুক কেউ রাখেনা । অনেক বাগীর মধ্যে সর্বশেষ যিনি তিনি এখনও জীবিত । নাম সিং কুশাওয়া । জীবনে একটি মাত্র মানুষ মারা এই বাগী একটি নামী বাগী পরিবারের মানুষ । হেসে বলেন, আমরা ডাকাত হলেও শত্রুদের মারি । অযথা মানুষ মারিনা । আমরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরি ।

আমার মাতামহ জমিদারের নায়েব ছিলেন । বন্দুক রাখতে হতো । খাজনা আদায় করতে গেলে সাথে নিয়ে যেতেন । আমার মা যেই চাকরি করতো তাতে নিজের সেফটির জন্য বন্দুক রাখতে পারতো অফিসিয়াল ভাবে । কিন্তু আমি নিজে বন্দুকে হাত দিইনি ।

সম্প্রতি এক **ইউ টিউব ভিডিওতে** চম্বল সম্পর্কে দেখে এগুলো মনে হল । ঐ একই ইউটিউবারের অন্য ভিডিও দেখে এক সাঁওতাল চিকিৎসকের কথা জানলাম । সেটা নিচে লিখলাম তবে এই চরিত্র আমার কল্পনা করা যদিও কথাগুলো সবই ঐ আদিবাসী মেয়েটির ।

একটু কল্পনা থাকনা , সবই সত্য হবার তো দরকার নেই । রহস্য আর কাহিনীই জীবনকে জীবন্ত করে । নাহলে সবই কি ভীষণ ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে যেতো বলো তো ! তার মানে এই কল্পনা আসলে হল, যদি এমন হতো ।

আমাদের সাথী ছিলো এক সাঁওতাল রমণী যিনি পেশায় স্কুল টিচার । ইতিহাস পড়ান । আমার আত্মীয়ের পরিচিতা । কথায় কথায় বলেছিলেন যে আদিবাসী সমাজে নারীকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হয় ।

ওদেরকে আলাদা কোনো জীব বলে দেখা হয়না ।

আধুনিক সমাজের এগুলি শেখা উচিৎ ওদের থেকে ।

এবং এখনকার শাসন ব্যবস্থার মতন ওদের সমাজেও নানান স্তরে শাসক হয় এবং বিভিন্ন এক্সপার্ট মানুষ নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা দিয়ে জীবনের উপযোগী করে তোলে । তাই আদিবাসীদের থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করা যেতে পারে । ওদের উপাসনাস্থল মুক্ত আকাশের নিচে । ওরা দেবতাকে মন্দির বা গীর্জায় বন্দী করে রাখেনা । প্রকৃতির সাথে ওদের অশেষ ভাব তাই ওরা প্রাকৃতিক নিয়ম ও বস্তুকে জীবন ও ধর্মের অঙ্গ করে নিয়েছে ।

এখানে মানে অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাব অরিজিন্যালদের থেকে অনেক কিছু শিক্ষা মেনস্ট্রিম সমাজে নেওয়া হয়েছে । যেমন ওরা জানে কি করে বিভিন্ন দূর্যোগের মোকাবিলা করতে হয় । আবার আদিবাসীদের এলাকায় চিকিৎসক হয়ে যেতে হলে এখানে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । আদিবাসীদের যথেষ্ট সম্মান প্রদান করা ও তাদের দেহের নানান দূর্বলতা থেকে সৃষ্ট ব্যামোকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে পূর্ণ সুস্থ করাই যাতে লক্ষ্য হয় তার জন্য ।

সাহেবরা সাহেবই তাইনা ?

ওদের চিন্তাভাবনা , দরদী মন ও নতুনকে জানার ইচ্ছেই যুগ যুগ ধরে তাদের বিশ্বের সেরা জাতি করে তুলেছে । জেনারেশান এর পর জেনারেশান ধরে ওরা কেমন সুন্দর ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানব জীবনকে । ধন্য পাশ্চাত্য , প্রাচ্যের প্রণাম লহ তুমি ।

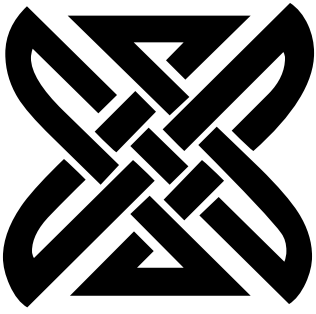

শেষ করার আগে আরেকটি জায়গার কথা বলি । এখানে আমি একটি নেপালি রেস্তোরাঁয় প্রায়ই খেতে যাই । আমার বাসা থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার হবে । স্থানটির নাম ব্রেড-উড । অর্থাৎ কাঠের রুটি যাকে বলে । সিডনি থেকে প্রায় ২০০ কিমি দূরত্ব ।এখানে মেষপালন করা হয় ও নানান বনজ বস্তুর কারবার হয়।

এলাকায়, আদিবাসী যারা ছিলো তাদের বলে ওয়ালবাঙ্গা মানুষ । এদের ভাষার নাম **থুর্গা বা দুর্গা অথবা ধুর্গা ।**

এরা মূলত কচু, ওল, নানান সবজি খেয়ে থাকতো । আমিষের মধ্যে মাছ, পসাম্ (এক জন্তু) ও অন্যান্য

পশু মেরে খেতো । **বছরের বিশেষ সময়ে ওরা অন্যান্য পাহাড়ে যেতো বগং মথ খেতে । মথ ধরে তা রোস্ট করে খেতো । সে এক বিশাল উৎসব ওদের ।**

আমি অবশ্যি নেপালি রেস্তোরাঁয় যাই থালি খেতে ।

ডাল, ভাত, তরকারি , কুকরা ।

আদিবাসীদের জীবন বদলে যায় ইংরেজ আসার পরে । সেটা ১৮২০ সাল । ওদের খাবারে কমতি দেখা যায় ।

বিদেশীরা নানান অসুখ নিয়ে আসে তাদের সাথে ।

স্মল পক্স , ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা , সিফিলিস্ ।

এদের সমস্ত সংস্কৃতি ও ধারাবাহিক জীবন নষ্ট হতে ১৮৫০ সাল অবধি লাগে ।

মথ খেতে যাওয়া তাদের ঐতিহ্য ছিলো বহু পাহাড় পেরিয়ে । তাও স্তব্ধ হয়ে যায় ।

ধীরে ধীরে তাদের জমিও বেদখল হয়ে যায় । একটা সময় তারা নিজভূমে পরবাসী হিসেবে সামান্য মাটির জন্য লড়তে শুরু করে ।

শোলাভেন নদীর তীরে প্রথম বিদেশীরা বসে ।

তাদের এলাকা তৈরি হয় কয়েদীদের দ্বারা । অনেক বাড়ি ও কাঠামো যা তারা তৈরি করেছিলো তা এখনো আছে । ডাঃ থমাস্ ব্রেডউড উইলসনের নামে এই স্থানের নামকরণ হয় । উনি একজন সার্জেন ও একটি জাহাজের প্রধান পরিচালক ছিলেন যার কাজ ছিলো কয়েদীদের অন্যান্য স্থানে নিয়ে যাওয়া । নিজ সরকারের থেকে পাওয়া জমি নিয়েই এই এলাকার সৃষ্টি হয়েছে । সপরিবারে থাকতেন । ধীরে ধীরে উনি

কমিউনিটির হেড হয়ে যান । এখানেই ওনার সমাধি আছে, একটি বিশাল পাইন গাছের নিচে ।

১৮৫১ সালে এখানে সোনা আবিষ্কৃত হয় । জনসংখ্যা বাড়ে । এখানে তখন অজস্র হোটেল ,ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য সংস্থার সৃষ্টি হয় । এটা আপাততঃ হেরিটেজ রেজিস্টারে স্থান পেয়েছে । বহু পুরানো স্থাপত্য আজও আছে । ভিক্টোরিয়ান ছাঁচে তৈরি সেইসব বিল্ডিং মনোমুগ্ধকর ।

আমি চলে যাই কোনো রেশমী চাঁদনীতে ।বাইরে প্রবল শীত । আমরা নেপালি দোকানে পুড়িয়ে খাই মাংস ও মাছ । মখমলের মতন আকাশে তারাদের জরির কাজ । মন ধেয়ে চলে অজানা কোনো অমৃত লোকে ।

এই নগরে বহু ছায়াছবি ক্যামেরা বন্দী হয়েছে ।

বিখ্যাত কবি জুডিথ্ রাইট এখানকার বাসিন্দা ।

হয়ত এই ঐতিহাসিক শহরের নীরবতায় বসে উনি অনেক তথ্য জানতে পারেন যা আমরা পারিনা । কারণ কবিদের নাকি তিনটে চোখ আর ভীষণ কোমল বোনাস মন থাকে--- যা দিয়ে ওরা অধরাকে ধরতে পারেন আর তাদের কলমের জন্যই জীবন সুন্দর হয় ।

আমরা চলার পথ খুঁজে পাই কবিদের কবিতা পড়ে যখন সীমানায় কাঁটাতার দেখা যায় অথবা দিগন্তে হেমন্তের বিষ ।।।।

তথ্যঋণ : আন্তর্জাল (ইন্টার্নেট)

শেষ

We can't help everyone but everyone can help someone.

Ronald Reagan

THE END